অন্নদাশঙ্কর রায়

টলস্টয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

মুক্তধারা ২১১১

প্রকাশক

চিত্তরঞ্জন সাহা

মুক্তধারা

[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]

২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা

মুক্তধারা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮০
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ১৯৯১
তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৫
চতুর্থ প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৭
পঞ্চম প্রকাশ : আগস্ট ২০০২
ষষ্ঠ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ শিল্পী : সরদার জয়নুল আবেদীন

সার্বিক পরিকল্পনা : জহর লাল সাহা

মুদ্রণ : এস আর প্রিন্টিং প্রেস

৭ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী লেইন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা

TALSTOY
[Critical Appreciation]
By Annadashankar Roy

Muktadhara Sixth Edition : February 2005

Cover Design : Sardar Jainul Abedin

Publisher : C. R. Saha

Planning : Jahar Lal Saha

MUKTADHARA
[Prop : Puthighar Ltd.]
22 Pyaridas Road, Dhaka
Bangladesh

Price : Taka 75.00

ISBN : 984-13-1682-X

অশোককুমার ও তৃপ্তি রায়
দু'জনের হাতে

ভূমিকা

টলস্টয়ের জন্মের পর দেড়শো বছর অতীত হয় ১৯৭৮ সালে। সেই উপলক্ষে যে জয়ন্তী উৎসব হয় আমিও তাতে যোগ দিই। অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি। সে সব একত্র করে একখানি বই প্রকাশ করা হচ্ছে। বইখানিতে টলস্টয় সম্পর্কে কিছু পুরানো লেখাও যাচ্ছে। পরিশিষ্টে থাকছে আমার ষোল বছর বয়সে লেখা টলস্টয়ের একটি উপকথার অনুবাদ। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত। অমনি করে আমার সাহিত্যিক শিক্ষানবীশী শুরু হয় টলস্টয়ের কাছেই।

আর একটু বড় হয়ে টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' পড়ি। সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার রস। তখন থেকেই আমার মনে টলস্টয়ের কীর্তি ও তত্ত্ব নিয়ে একটা বিতর্ক চলে। তাঁর 'হোয়াট ইজ আর্ট' আমাকে দোলা দেয়। কিন্তু আমি তাঁর তত্ত্ব নির্বিবাদে মেনে নিতে পারিনি। প্রশ্নটি অন্য আকারে তুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে, রম্যা রঁলার কাছে। নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আলোয় নিজের পথ দেখতে পাই।

সম্প্রতি মস্কো থেকে প্রকাশিত Victor Shklovsky প্রণীত টলস্টয়জীবনী পড়েছি। তার ফলে অনেক রহস্যের মর্মভেদ করতে পেরেছি। প্রচুর পরিমাণে আত্মনিন্দা করে টলস্টয় আর্ট সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন সেটা তিনি নিজেই লঙ্ঘন করেন পরবর্তী কালে 'রেজারেকশন' ইত্যাদি উপন্যাস লিখতে বসে। তাঁর কৈফিয়ত তুলে দিচ্ছি ঃ

"These stories are written in my old style, which I don't approve of now. If I start changing things until I'm quite satisfied, I'll never finish"

বেশ বোঝা গেল যে পুরানো অভ্যাস ছাড়া সহজ নয়, ওটা পালন করাই সহজ। বড়ো গল্প বা বড়ো উপন্যাস লিখতে হলে 'তেইশটি উপকথা'র আদর্শ কার্যকর নয়। কেবল উপকথা লিখেই সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরিয়ে দেওয়া যায় না।

'সময় ও শান্তি' তথা 'আনা কারেনিনা' টলস্টয় নিজেই নস্যাৎ করেন এই কারণে যে ওই বইগুলো টাকার জন্যে লেখা। কিন্তু 'রেজারেকশন' ও কি টাকার জন্যে লেখা নয়? দরাদরি করে টলস্টয় এর জন্যে এনতার টাকা পান। তফাৎ শুধু এই যে টাকার সমস্তটা দুখোবরদের দেশত্যাগের তহবিলে খয়রাত করেন। খয়রাতের জন্যে টাকা তুলতে যদি উপন্যাস লিখতে হয় তো সেটাও টাকার জন্যে লেখা। সেটাকেও নস্যাৎ করতে হয়। তা কিন্তু টলস্টয় করেননি। ভাগ্যিস

এসব খুঁতখুঁতানি যৌবনকালে ছিল না। থাকলে কি আমরা বিশ্ব-সাহিত্যের দু'খানি সেরা ক্লাসিক পেতুম? রসের বিচার আর নীতির বিচার এক নয়। টাকার জন্যে গান করা হয়তো সুনীতি নয়, কিন্তু তা হলে ওস্তাদদের কী দশা হবে? টাকার জন্যে ছবি আঁকা হয়তো সুনীতি নয়, কিন্তু তা হলে চিত্রশিল্পীদের কী দশা হবে? টাকার জন্যে শেকসপীয়ারের নাটকও লেখা হয়েছিল। সেটা হয়তো সুনীতি নয়। কিন্তু টাকার জন্যে না লিখলে সেসব নাটক কোনোকালেই লেখা হতো না। শেকসপীয়ারও আর কিছু করতেন। তাঁর প্রতিভার দান থেকে মানবজাতি বঞ্চিত হতো। টাকা না বলে ওটাকে পারিশ্রমিক বললেই নীতির দিক থেকে নিন্দনীয় হয় না। ডাক্তারের যেমন ফী।

এই জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারা গেল যে 'আনা কারেনিনা' রচনার পূর্বে টলস্টয় তার একটি খসড়া তৈরি করেছিলেন। তাতে নায়িকার বয়স ছিল ত্রিশ, নায়কের ছিল পঁচিশ আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল যে আনার বয়স বেশী, ভ্রনস্কির বয়স কম। কিন্তু উপন্যাসটির কোথাও বয়সের উল্লেখ নেই। শুধু একটি সঙ্কেত রয়েছে আনার কথায় যে ভ্রনস্কি হচ্ছে একটি 'অফিসার ল্যাড'। এরূপ ক্ষেত্রে নায়িকার পক্ষে একটা হারাই হারাই ভাব থাকবেই। সেই ভীতি থেকে সন্দিগ্ধতা আর ঈর্ষা। অবশেষে ট্র্যাজেডী।

আরো জানা গেল এ উপন্যাসের আরম্ভটা কী ধরনের হবে তা নিয়ে টলস্টয় বহু ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই দিশা পাচ্ছিলেন না। কে যেন ফেলে গেলেন পুশকিনের একখানা উপন্যাস। সেটার পাতা ওলটাতে গিয়ে টলস্টয় আবিষ্কার করেন তার ধানাই-পানাইবর্জিত গৌরচন্দ্রিকাহিন আরম্ভ। ব্যস। টলস্টয়ও সেই ছাঁদে আরম্ভ করেন 'আনা কারেনিনা'। হাজার মাথা খুঁড়েও যেটা পাচ্ছিলেন না সেটা পেয়ে গেলেন দৈবক্রমে। অমনি শুরু হয়ে গেল রচনা।

'আনা কারেনিনা'র শতবর্ষপূর্তিও তার স্রষ্টার জন্মের অর্ধশত-বর্ষপূর্তির সমসাময়িক। তাই আমি 'আনা কারেনিনাকে'ই আমার এই প্রবন্ধসংগ্রহের মধ্যমণি করেছি। নরনারীর প্রেম ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, ভালোই হোক আর মন্দই হোক, মিলনান্তই হোক আর বিয়োগান্তই হোক সাহিত্যজগতের একটি চিরন্তন বিষয়বস্তু। তথা মানবহৃদয়ের এক চিরন্তন রহস্য। টলস্টয়ের এই উপন্যাস দেশকালের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর আবেদন নৈতিক নাই বা হলো

৫ই ভদ্র ১৩৮৭ — অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচীপত্র

টলস্টয়

টলস্টয়ের কাছে সাহিত্য সৃষ্টি ছিল গৌণ। মুখ্য ছিল সত্য কথা বলা ও সত্যভাবে বাঁচা। মিথ্যাকে তিনি বিষম ঘৃণা করতেন। যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে। শেষ বয়সে এটা একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছিল। শুচিবাতিকের মতো সত্যবাতিক।

এর সূচনা প্রথম বয়সে। উনিশ বছর বয়সে যখন তিনি ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেন তখন তিনি মনে মনে সংকল্প করেন যে লেখনীর মুখে সত্য বলবেন। পূর্ণ সত্য। সত্য ব্যতীত আর কিছু নয়। সাক্ষীরা যেমন ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে শপথ নেয়। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও এত কঠোর ছিল না। সত্য বলা একরকম চলে, কিন্তু পূর্ণ সত্য বলা আদৌ নিরাপদ নয়। সত্য ভিন্ন আর কিছু না বললে বড় বড় ব্যাপারে মৌন থেকে যেতে হয়।

ডায়েরিতে তিনি প্রাণ খুলে যা লিখেছিলেন তা প্রকাশের জন্যে নয়। এমন কি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির চোখে পড়বার জন্যেও নয়। তখনো তিনি জানতেন না যে পরে একদিন তিনি সাহিত্যিক হবেন বা বিয়ে করবেন বা তাঁর ডায়েরি স্ত্রীকে পড়তে দেবেন বা জগৎকে দেখতে দেবেন। জানলে হয়তো তাঁর হাত বেঁকে যেত। সত্য লিখলেও পূর্ণ সত্য লিখতেন না। সত্য ভিন্ন আর কিছু না লিখলে লেখা বন্ধ হয়ে যেত। একেই বলে অজ্ঞতা হচ্ছে আশীর্বাদ।

লিখতে লিখতে ক্রমে হাত খুলে যায়। বুঝতে পারেন যে তাঁর লেখার হাত আছে। তাঁর পিসিমা তাতিয়ানাও তাঁকে উৎসাহ দেন এই বলে যে, তাঁর যেমন কল্পনার দৌড়, কেন যে তিনি উপন্যাস লেখেন না এটা আশ্চর্য। কিন্তু হাজার লিপিকুশলতা ও কল্পনাশক্তি থাকলেও তিনি মহান লেখক হতেন না। তেমন প্রতিভাও তাঁর ছিল না। হলেন তাহলে কোন্ মন্ত্রবলে? সত্যভাষণের সাধনাবলে। সত্যভাষণ হলো এমন এক ডিসিপ্লিন যার কল্যাণে ক্ষুদ্রও মহান হতে পারে। তবে মহান শিল্পী হবে কি না নির্ভর করছে আরো একটা উপাদানের

ওপরে। কেউ যদি অসার জীবন যাপন করে তবে তার সেই অসার উপলব্ধি দিয়ে মহান সৃষ্টি হবে কী করে, লিখলইবা সে প্রাণ খুলে সত্য কথা, পুরো সত্য কথা, সত্য ভিন্ন আর কোনো কথা নয়।

সার অভিজ্ঞতার ওপরে টলস্টয়ের প্রখর দৃষ্টি ছিল। পাঁকে ডুবে থাকলেও পঙ্কজকে তিনি ভোলেননি। সত্যকে তিনি কোথায় না অন্বেষণ করেছেন! অস্থানে-কুস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আরণ্যকদের মধ্যে, অভিজাত মহলে, কৃষক সংসর্গে, বন্যপ্রাণীমৃগয়ায়, বেদে-বেদেনীর সান্নিধ্যে। লিখতে বসে সব অভিজ্ঞতাই তাঁর কাজে লেগে গেল। কিন্তু যার জন্যে তিনি টলস্টয় তা হচ্ছে যুদ্ধের ভিতরকার সার সত্যকে মোহমুক্ত ভাবে দেখা ও দেখানো। তাকে রোমান্টিক করতে গিয়ে অসত্য করে না তোলা। যুদ্ধবিষয়ক রিপোর্টে বা রচনায় কেউ সত্য কথা লেখে না। ঘটনা ঘটে যাবার পর রটনায় পল্লবিত হয়। ঐতিহাসিকরাও সেই রটনার নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করতে জানেন না। সত্য এমন লজ্জাকর বা জঘন্য যে তাকে ইচ্ছা করে বিকৃত করা হয়। পরম কাপুরুষও পরম বীর বলে পরিচিত হয়। ঘোড়া হয়তো প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, বীর ভাবছেন তিনিই তাকে রাশ ধরে চালাচ্ছেন। ঘটনা হয়তো আপনি ঘটে যাচ্ছে। সেনাপতি ভাবছেন তাঁর আদেশে ঘটছে। গৌরবের জন্যে বানানো গল্পও সত্য বলে প্রচলিত হয়। টলস্টয় এই চক্রান্ত ফাঁস করে দেন।

'সমর ও শান্তি' লিখে টলস্টয় বহু লোকের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। বছর পাঁচেক লাগল ও-বই লিখে শেষ করতে ও আরো বছর দশেক স্বদেশের স্বীকৃতি পেতে। এর পরে তিনি যা নিয়ে লেখেন সেও এক বিপজ্জনক বিষয়। নর-নারীর সাজানো সংসারে স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্যাশন যতক্ষণ নীতির সীমার মধ্যে থাকে। যখন সীমার বাইরে চলে যায়। 'আনা কারেনিনা' তখনকার দিনে এক দুঃসাহসিক কীর্তি। টলস্টয় যাকে নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ মনে করেছিলেন একালের বিদগ্ধ পাঠক তাকে বলবেন সংস্কার, সংসার ও সমাজবিধির সঙ্গে সংঘাত। আনা এমন কোনো চিরন্তন মহাপাতক করেনি যার জন্যে অত বড় একটা শাস্তিই ছিল তার নিয়তি। তা সত্ত্বেও তার কাহিনীতে চিরকালের ট্র্যাজেডির উপাদান ছিল। প্রেমিকের একনিষ্ঠতায় সন্দেহ। তাই ও-বই শিল্পলক্ষ্যভ্রষ্ট নীতিগ্রন্থ হয়নি। অপর পক্ষে নীতিনিরপেক্ষ বাস্তববাদী চিত্রকর্মও নয়। সত্যের অন্বেষক অত সহজে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এইখানে সমসাময়িক ফরাসি কথাশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা। পরবর্তী যুগের কথাসাহিত্যকদের সঙ্গেও।

তাঁর ওই দু'খানি মহা-উপন্যাস মহাকাব্য জাতীয়। বলা যেতে পারে একালের মহাভারত ও রামায়ণ। অবশ্য অন্য প্রকার। মানুষের জীবনে নিয়তির

হাতই তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাই মানুষকে ক্ষমাযোগ্য করেছেন। এক নেপোলিয়ন বাদে অমার্জনীয় কেউ নয়। যারা নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, অথচ নিয়তির দ্বারা চালিত হয় তাদের প্রতি তাঁর অপার করুণা। কিন্তু মন্দ মানুষকে বা মন্দকারীকে ভালোবাসেন বলে তিনি মন্দকে ভালো বলেন না। মন্দত্বের প্রতি তাঁর লেশমাত্র সহানুভূতি নেই। এইখানেও তাঁর সঙ্গে তাঁর বাস্তববাদী সহযোগী ও পরবর্তীদের প্রতি তুলনা। ভালো আর মন্দকে তিনি যেমন সাদা আর কালোর মতো স্বতোবিরুদ্ধ মনে করতেন একালের বিদগ্ধ সাহিত্যিকরা তেমন মনে করেন না। বহুক্ষেত্রে ভালো-মন্দ একাকার বা অনুপস্থিত। সত্য অনেক সময় ভালো-মন্দের অতীত। সত্য শুধুমাত্র সত্য। ভালোও নয়, মন্দও নয়। সর্ববিশেষণ-বর্জিত।

গোড়াতেই বলেছি যে সাহিত্যসৃষ্টি টলস্টয়ের কাছে গৌণ ছিল। ইংরেজরা যেমন বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য লাভ করে তিনিও তেমনি ডায়েরি লিখতে গিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। বছর পঞ্চাশ বয়সে কীর্তির ও যশের ও বিত্তের শিখরে উঠে কোথায় তিনি আনন্দ করবেন তা নয়। চাইলেন সত্যভাবে বাঁচতে। জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করতে। প্রথমে তাঁর আপনার। পরে তাঁর স্বদেশের ও স্বকালের। জীবনজিজ্ঞাসা বরাবর তাঁর কাছে মুখ্য ছিল। অল্প বয়স থেকেই তিনি জীবন-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, ঈশ্বর ও অমরত্ব নিয়ে চিন্তাকুল। বাণপ্রস্থের বয়স যখন হল তখন তিনি সাহিত্যসৃষ্টি ছেড়ে পরামার্থে মন দিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এটা মস্ত বড় একটা লোকসান। কি রাশিয়ায় কি অন্য দেশের কথাশিল্পে 'আনা কারেনিনা'-র পরে আর ক্লাসিক লেখা হলো না। হতে পারত যদি টলস্টয় মন খোলা রাখতেন। কিন্তু মনটা হলো তাঁর দায়বদ্ধ। আত্মোদ্ধারের দায়। মানব উদ্ধারের দায়। সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে হিংসার হাত থেকে, অসত্যের হাত থেকে। তার জন্যে সত্যভাবে বাঁচতে হবে।

বিশেষ করে রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে বিপ্লবের হাত থেকে, যুদ্ধের হাত থেকে। এমনি গভীর ছিল তাঁর ইতিহাসদৃষ্টি যে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিপ্লব আসছে, যুদ্ধ আসছে। বাইবেলে আছে পয়গম্বর নূ (Noah) আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন যে মহাপ্লাবন আসছে, সৃষ্টি লুপ্ত হবে। তাঁর স্ত্রীকে সে কথা বলায় ভদ্রমহিলা বিশ্বাসই করলেন না। টলস্টয়ের পরিবারেও সেই পুরাণবর্ণিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হলো। টলস্টয় উঠে-পড়ে লেগে গেলেন জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ বদলাতে ও শোধরাতে। যাদের পিঠে চড়ে বসেছেন তাঁদের পিঠ থেকে নামতে। চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হতে। তাদের

একজন বসে যেতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কে একজন গান্ধী পর্যন্ত তাঁর কথা শুনে তাঁর অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁর নিজের গৃহিণীর কানে একটি কথাও গেল না। যুদ্ধ আর বিপ্লব দুই দেখতে বেঁচে রইলেন কাউন্টেস। টলস্টয় বেঁচে গেলেন তার আগে মরে।

যুদ্ধ আর বিপ্লবের মতো মৃত্যু ছিল তাঁর আর-এক ধ্যান। সত্যভাবে বাঁচলে যুদ্ধ ও বিপ্লব এড়ানো যায়, মৃত্যু অনিবার্য। তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর এই নিয়েও মেখলা ছিল। জীবনের অর্থের জন্যে তিনি খ্রিস্টমার্গে বিশ্বাসী হন। কিন্তু প্রচলিত খ্রিস্ট-ধর্মে তাঁর ঘোর অনাস্থা। পিছিয়ে যেতে যেতে তিনি চলে গেলেন যিশু খ্রিস্টের জীবনকালে। আদি খ্রিস্টবচনই হলো তাঁর ধর্ম। শোষণ ও হিংসার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে বেধেছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত। এবার বাধল খ্রিস্টমার্গচ্যুত চার্চের সঙ্গে। একা টলস্টয় লড়তে লাগলেন দুই মহাশক্তির সঙ্গে। রাষ্ট্রের সঙ্গে। চার্চের সঙ্গে। সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা বড় কম। বলাবাহুল্য মিলটনের মতো টলস্টয়ও লেখনীকে তরবারি করেছিলেন। খুরধার তরবারি। কিন্তু মিলটনের পিছনে সম্প্রদায় ছিল। টলস্টয় সম্পূর্ণ একলা। দানবের বল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। দানবও ছিলেন প্রথম যৌবনে। সেই বলের যেই সদ্ব্যবহার হলো অমনি তাঁরও রূপান্তর ঘটল। তিনি হলেন মহামানব। যে হাতে কলম সেই হাতে বন্দুক ছিল একদা। বন্দুকও গেল। তার বদলে এক চাষী ও মুচির হাতিয়ার। মদ্য-মাংস ইত্যাদি পঞ্চ ম-কার গেল। রাজসিক হলেন সাত্ত্বিক। কিন্তু সব পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি যোদ্ধা। বার্ধক্যে তাঁর যুদ্ধ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, চার্চের বিরুদ্ধে।

সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো, ঠিক। কিন্তু লাভবানও হলো। কারণ তাঁর শেষ বয়সে লেখা গল্পগুলি নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক বলে বিস্মরণীয় নয়। শিল্পীসুলভ চাতুরী তিনি ষষ্ঠ ম-কারের মতো বর্জন করেছিলন। তা সত্ত্বেও– বোধহয় সেইজন্যেই– 'আইভান ইলিচের মৃত্যু', 'প্রভু ও ভৃত্য' প্রভৃতি কাহিনীগুলি অন্তরকে উদ্বেল করে, সারা জীবন মনে থাকে, অলক্ষিতে জীবনকে বদলে দেয়। কী করে বলি যে এসব আর্ট নয়? হ্যাঁ, এগুলিও আর্ট। তবে এই একমাত্র আর্ট নয়। টলস্টয় বললেও না। অপরপক্ষে 'সমর ও শান্তি'ও আর্ট। 'আনা কারেনিনা'ও আর্ট। টলস্টয় না বললেও আর্ট। শেষের দিকে তিনি 'দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন' হয়েছিলেন। তাই নিজের কীর্তিকে ভস্ম করতে না চান, ছাইভস্ম মনে করেছিলেন। এটাও একপ্রকার শুচিবাতিক। কিন্তু এর আরো একটা কারণ আছে। সেটা আরো গভীর।

নিজের পূর্বজীবনকে কাটিয়ে ওঠা এক কথা। তাকে খারিজ করা অন্য জিনিস। তিনি কাটিয়ে উঠে ক্ষান্ত হবেন না। সরাসরি খারিজ করবেন। যেহেতু রিপুর তাড়নায় অনেকগুলো পাপ করে ফেলেছিলেন। না জেনে কারো কারো সর্বনাশও। অনুতাপ তাঁর মতো আর কে এত করেছে! দুনিয়াকে নিজের স্খলন-পতন-ত্রুটির কথা কে এমন নির্মমভাবে শুনিয়েছে। ডায়েরিও প্রকাশ হলো তাঁর ইচ্ছায়। তবে পরিবারের মুখ চেয়ে কতক বাদসাদ দিয়ে। লোকে তাঁকে জুতো মারুক, এই তিনি চেয়েছিলেন। ভাবীকাল তাঁকে মাথায় করে রেখেছে। তিনি সত্যকুলজাত।

অন্যতম গুরু টলস্টয়

টলস্টয় আমার অন্যতম গুরু। কী জীবনে কি শিল্পে। যেমন রবীন্দ্রনাথ। দু'জনে এঁরা বন্ধনীভুক্ত। কেউ কারো চেয়ে বড়ো বা ছোট নন। ষোল বছর বয়সে আমি টলস্টয়ের 'তেইশটি কাহিনী' পুরস্কার পাই। তার একটি বাংলায় অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আর রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' পড়ি তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কিছুদিন পরে। যখন আমার বয়স দশ কি এগারো। 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' বুঝতে কষ্ট হয়, মুগ্ধ হয়ে পড়ি 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়।' বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র' হাতে পাই। 'ঘরে-বাইরে' বুঝতে পারিনে, 'সবুজের অভিযান' মুখস্থ করি। 'প্রবাসী'তে পড়া হয়ে যায় 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র বহু কবিতা।

টলস্টয়ের কাহিনীগুলির ভিতর দিয়ে তিনি যা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তা জীবনের মূলনীতি ও জীবনদর্শন। কিন্তু আমি চাই রস ও আনন্দ। বছর কয়েক পরে আমার নজরে আসে 'আনা কারেনিনা'। তন্ময় হয়ে পড়ি। সব কথা যে বুঝি তা নয়, কতইবা বয়স; আঠারো কি উনিশ। আরো কিছুদিন পরে পড়ি 'হোয়াট ইজ আর্ট'। সব কথা বোঝা আরো কঠিন। মোটামুটি হৃদয়ঙ্গম হয় যে আর্ট হবে সত্য ও শিব। সুন্দর না হলেও চলে। ওদিকে আমি রাশি রাশি কন্টিনেন্টাল নাটক-নভেল পড়েছি। জীবনের সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য সুন্দর মিছিল করে চলেছে। কী তার বৈচিত্র্য। কী তার আকর্ষণ। জীবনকে আমি আর্টের দর্পণে নিরীক্ষণ করব, না ধর্ম ও নীতির নিকষ দিয়ে কেবল শুভটুকুই আর্টের বিচারে সোনা বলে যাচাই করব।

পঞ্চাশোর্ধ্বে টলস্টয় বনে না গেলেও বাণপ্রস্থ নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের যৌবনের ভরা গঙ্গা তাঁর অমনোনীত হয়েছিল। সেই ভরা যৌবনের সৃষ্টিকেও তিনি নীতির বিচারে খাটো মনে করতেন। এতে কিন্তু আমার মন সায় দেয়নি। ভালো-মন্দের বিবেক তাঁর মতে সমাজের বেলায় যেমন শিল্পের বেলায়ও

তেমনি। ভালো কবিতা, ভালো গান, ভালো ছবি, একথা যখন বলব তখন কি এই কারণে বলব যে কবিতাটা বা ছবিটা লোকহিতকর, শিক্ষাপ্রদ, নীতিসম্মত? মানুষের সহজাত রসবোধ ও রূপবোধকে দমন না করে এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আর্টের সংজ্ঞাকে সঙ্কুচিত করে তাকে ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রের সীমানার ভিতরে আনতে গেলে যা হয় তা যেন চীনদেশের মহিলাদের লোহার জুতো পরানো। সুন্দরীকে সতী বানানোর এই সাধু অভিপ্রায় আর্টকে এত উচ্চে তুলে নিয়ে যাবে যে তাকে আর আর্ট বলে চেনা যাবে না। তার চেয়ে হতে দাও না কেন তাকে অসতী। হোক না সে আনা কারেনিনা।

আমি 'আনা কারেনিনা'কেই আর্টের আদর্শ ভাবি। 'সমর ও শান্তি' তো অনেকের মতে এ যুগের মহাকাব্য 'ইলিয়াড'। আমার মতে ওর সঙ্গে সমান বলে গণ্য হতে পারে একমাত্র ডস্টয়েভস্কি রচিত 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'। 'ইলিয়াডে'র পর 'অডিসি' লেখাই ছিল প্রত্যাশিত, কিন্তু 'আনা কারেনিনা' আর একখানি 'অডিসি' নয়। তা সত্ত্বেও সে উপন্যাস একালের পাঁচ-সাতখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্যতম। তাকে কোনো কারণেই খাটো করা যায় না। যে দুটি সোপানের ওপর দাঁড়িয়ে টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যের উচ্চতম স্তরে উঠে ছিলেন সে দুটি যদি তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে যায় তবে তাঁর উচ্চতাইবা থাকে কোথায়! কেনইবা লোকে তাঁর বাণী শুনবে, তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে ঋষি হয়েছেন বলে!

ঋষি টলস্টয় এর পরে শিল্পের সাধনা ছেড়ে জীবন-মরণের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করেন। বেদ উপনিষদ্ গীতা বাইবেল কোরান বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে অধ্যয়ন করেন। চার্চের ভাষ্য ত্যাগ করে সরাসরি যিশু কথামৃত আস্বাদন করেন। যিশুর বাণী আদি খ্রিস্টানদের মতো অনুসরণ করেন। কোনো কারণেই নরহত্যা করা চলবে না, মানুষমাত্রেই তোমার ভাই ও তোমার পিতার সন্তান। হিংসার প্রতিশোধ হিংসা দিয়ে নয় প্রেম দিয়ে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত অন্ন গ্রহণ করবে, অপরের পরিশ্রমের ফল থেকে তাকে বঞ্চিত করবে না। চাষীর মতো পোশাক পরে মুচির মতো জুতো তৈরি করা হলো টলস্টয়ের নিত্য কর্ম। তবে ওর থেকে তাঁর কোনো আয় ছিল না, চলত অন্য আয়ে। জমিদারির স্বত্ব তিনি স্ত্রীকে লিখে দেন। কিন্তু গ্রন্থস্বত্ব সর্বসাধারণকে দিতে চাইলে পরিবারের কাছে থেকে দুস্তর বাধা পান। শেষে এইভাবে রফা হয় যে ঋষি হবার পূর্বে তিনি যেসব গ্রন্থ লিখেছিলেন সেসব গ্রন্থের স্বত্ব স্ত্রীকে লিখে দেন, সেইগুলিই তাঁর সোনার খনি। বাস একান্নে। তিনি খেতেন নিরামিষ।

কপিরাইট না থাকায় ঋষির বাণী দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে যায়। ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা তাঁতে বোনা কাপড়ের চাষীর পোশাক পরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। দেখলে চেনা যায় কে কে টলস্টয়পন্থী। কে কে উচ্চস্তর থেকে নেমে এসেছেন। দেক্লাসে বা ডিক্লাসড। টলস্টয় মাঝে মাঝে মস্কো যেতেন। একবার সেখানকার থিয়েটারে ঢুকতে গিয়ে বাধা পান। দারোয়ান বলে, "এই চাষী। তুই এর বুঝবি কী! এসব তোদের জন্যে নয়।" কে একজন ব্যাপারটা দূর থেকে লক্ষ্য করে ছুটে আসেন। বলেন, "সর্বনাশ। মানুষ চিনতে পারো না! ইনি যে কাউন্ট লেও টলস্টয়।" দারোয়ান লজ্জায় ভয়ে জড়সড়। টলস্টয় তাকে সাধুবাদ দেন। "তুমি ঠিকই চিনেছ যে আমি একজন মুজিক। তুমিই ঠিক চিনেছ, আর কেউ নয়।" চাষী বলে তাঁকে ভুল করাতে তিনি মহাখুশি।

রুশদেশে যেটা ছিল একটা কাল্ট সেটা দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ভারতীয় ব্যারিস্টারের কাছে হয়ে দাঁড়ায় জীবনযাপনের এক শ্রেয়স্কর পন্থা। তাঁর সহচরদের নিয়ে তিনি স্থাপন করেন টলস্টয় ফার্ম। এঁরা সবাই সত্যাগ্রহী। তিনি এই পন্থা অবলম্বন না করলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকেও পরে কেউ মহাত্মা গান্ধী বলত না। তিনিও ভারতে ফিরে এসে দক্ষিণ আফ্রিকার জের টেনে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতেন না, টলস্টয় ফার্মের জের টেনে সাবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতেন না, হাতে কাটা সুতো দিয়ে তাঁতে বোনা খদ্দর প্রচলন করতেন না। ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন গান্ধীজী বলেন, "আমার হাতে যদি শাসনক্ষমতা পড়ত তা হলে আমি টলস্টয়ের বোকা আইভানের মতো রাজত চালাতুম।" টলস্টয়ের প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর মনের অতলে কাজ করছিল।

টলস্টয়ের আপন দেশে যাঁর আবির্ভাব ঘটে তিনি গান্ধী নান, লেনিন। তাঁর গুরু টলস্টয় নান, মার্কস। তাঁর পন্থা টলস্টয়পন্থা নয়, মার্কসপন্থা। রুশদেশের বিপ্লবীরা টলস্টয়কে বিদেশে রফতানি করে মার্কসকে স্বদেশে আমদানি করেন। সেইভাবেই তাঁরা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। আর অন্যভাবে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন গান্ধীজী, টলস্টয় যাঁর পথপ্রদর্শক। রাশিয়ায় যা পরিত্যক্ত হয় ভারতে তা গৃহীত হয়। অবশ্য তাঁর সমস্তটা নয়, সব সময়ের জন্যে নয়।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজীও টলস্টয়ের মতো বলতেন আমি মন্দ, পুলিশ মন্দ, কোর্ট মন্দ, জেল মন্দ, এর প্রত্যেকটি হচ্ছে পীড়নের যন্ত্র, এই চারটি স্তম্ভের ওপর যে দাঁড়িয়ে আছে সেই রাষ্ট্রও মন্দ। এমন এক সমাজ চাই যেখানে আমি নেই, পুলিশ নেই, কোর্ট নেই, জেল নেই, সুতরাং রাষ্ট্রও নেই। অথচ শাস্তি আছে, কিন্তু তা কায়িক নয়। আর তার উদ্দেশ্য সংশোধন। গান্ধীজী টলস্টয়ের

মতো এই আদর্শ সমাজকেই বলতেন কিংডম অব গড, ভগবানের রাজ্য, সাধারণ পরিভাষায় রামরাজ্য। পরে এই কথাটির কদর্থ হয়। রাম এখানে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র নন, ভগবানের অন্যতম নাম।

ইংরেজ চলে গেলে স্বরাজ হবে, কিন্তু স্বরাজ হলে কি আর্মিও তুলে দেওয়া হবে, পুলিশও তুলে দেওয় হবে, কোর্টও উঠিয়ে দেওয়া হবে, জেলও উঠিয়ে দেওয়া হবে? গোড়ায় গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল তাই, কিন্তু একটু একটু করে উপলব্ধি করেন যে ছোটখাটো একটা সৈন্যদল রাখতে হবে, আর রাখতে হবে তেমনি ছোটখাটো একটা পুলিশ। বিচার যদিও প্রধানত গ্রাম্য পঞ্চায়তেই হবে তবু হাইকোর্ট থাকাও দরকার, আর জেল না বলে তাকে শোধনাগার বলাই ভালো, সেও থাকবে ছোটখাটো আকারে। মার্কসবাদের যেমন রিভিসন হয়েছে বলে শোনা যায়, করেছেন যাঁরা তাঁরা রিভিসনিস্ট, টলস্টয়বাদেরও তেমনি রিভিসন করেছেন স্বয়ং গান্ধীজী। এছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। তাঁর একটা অপোজিশন ছিল, সেই অপোজিশন হিংসায় বিশ্বাস করত, তাকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে না দিলে সে শান্তি দিত না, শৃঙ্খলা রাখত না, আদালতের হুকুম না হলে তাকে জেলে আটক করা যেত না। তাহলে কি কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পদত্যাগ করতে হতো? এ সমস্যা দেখা দেয় কংগ্রেস যখন প্রথমবার প্রাদেশিক সরকারে সমাসীন্ হয়। গান্ধীজী তার আগেভাগেই কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেস ছাড়লেও কংগ্রেস তাঁকে ছাড়বে না। তিনি সেবা গ্রামে বসে পলিসি বাতলে দেন। অপোজিশন যখন তুঙ্গে ওঠে তখন তাকে ক্ষমতার আসনের ভাগ না দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে অপোজিশনেরই সরকার গঠনের পালা, কিন্তু সংখ্যালঘু দল তো সরকার গঠন করতে পারে না। তাই ইংরেজ সরকারের কর্মচারীরাই রাজত চালান। পরীক্ষা করে দেখা গেল এটা একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। মতবাদের রিভিসন চাই।

মুসলিম লীগকে ক্ষমতার একাংশ ছেড়ে না দিয়ে দেশের একখণ্ড ছেড়ে দেয় কংগ্রেস। তারপর বাকি খণ্ডের জন্যে যে সংবিধান রচনা করে তা গান্ধীবাদী বা টলস্টয়বাদী সংবিধান নয়। গান্ধী ততদিনে নিহত। তাঁর শিষ্যরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর টলস্টয়ের শিক্ষা তো তাঁর নিজের দেশেই অচল, ভারতে তার প্রয়োগ করতে যাবে কে? লোকে সফলকেই পূজা করে, বিফলকে নয়। স্বাধীন ভারতে লেনিনেরই কদর বেড়ে যায়, গান্ধীভক্তদের অনেকেই মার্কস-

লেনিন উপাসনা আরম্ভ করেন। আমার এক প্রিয় বন্ধু একাধারে গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদী। আরেক বন্ধু গান্ধীবাদ থেকে সরে যেতে যেতে মার্কসবাদী বনে গেছেন। আবার এটাও লক্ষণীয় যে পাকা কমিউনিস্টরা কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করছেন, এই তো সেদিন একজন মরণপণ অনশন ঘোষণা করলেন।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে গান্ধীজী টলস্টয়পন্থা থেকে বেশ কিছুদূর অপসরণ করলেও অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিচ্যুত হননি। কায়িক শ্রম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্ন উপার্জন, চরকার সুতো তাঁতে বুনে বস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি তাঁর জীবনের শেষদিনটি অবধি রক্ষা করেছিলেন। এখনো তিনি বেঁচে আছেন সেই কার্যক্রমের ভিতর দিয়ে তাঁর অনুগত শিষ্যদের মধ্যে। টলস্টয়ের প্রভাবও এইভাবে বেঁচে আছে। মুজিকের পোশাক পরে এঁরা এখনও ঘুরে বেড়ান। এর নাম পদযাত্রা। আদি খ্রিস্টানদের মতো এঁদেরও বিশ্বাস স্বর্গরাজ্য একদিন আসবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এঁদের পুত্র-কন্যাদের নিয়ে। যদি কারো পুত্র-কন্যা থাকে। তারা আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত সন্তানের মতো জীবনযাপন করতে চায়। কেউ হবে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ হবে ডাক্তার। এসব কাজ তো মন্দ নয়। শ্রেণীচ্যুত হতে একজনেরও ইচ্ছা নেই। শ্রমিকদের মধ্যে কৃষকদের মধ্যেই বরং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মধ্যবিত্ত হতে আগ্রহ। ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলগুলোর সংখ্যা যে বেড়ে যাচ্ছে তার একটা কারণ শ্রমিক-কৃষকরাও তাদের সন্তানদের সেখানে পড়তে পাঠাচ্ছে। তারাও প্রথমে হাফপ্যান্ট ও পরে ফুল প্যান্ট পরছে। স্কুলে যারা যাচ্ছে না তারাও।

টলস্টয়ের নিজের ঘরেই বিদ্রোহ মাথা তুলেছিল। তাঁর এক ছেলে তো সোজা গিয়ে আর্মিতে যোগ দেয়। যেটা সবচেয়ে নৃশংস রেজিমেন্ট সেই ব্ল্যাক ওয়াচে। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। টলস্টয় অসহায়। আরেক ছেলে তো কঠিন অসুখের সময় তাঁকে দেখতে আসবে না। সে বলে তার বাবা আগেভাগেই বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে তার বিখ্যাত সাহিত্যিক হবার পথরোধ করে বসে আছেন। বিপ্লবের পরে আরেক ছেলের মন্তব্য, "এর জন্যে দায়ী হচ্ছেন বাবা। তিনিই তো বিপ্লবের নাটের গুরু।"

এদেশেও যদি কোনো দিন বিপ্লব ঘটে তবে যাদের সর্বস্ব যাবে তারাও হয়তো বলবে, 'এর জন্যে দায়ী হচ্ছেন বাপু। তিনিই তো বীজ বুনে গেছেন।' সেটা যে নেহাৎ একটা ভ্রান্ত ধারণা তা নয়। এস্টাব্লিশমেন্ট বলতে যা বোঝায় তা কেবল একমুঠো ইংরেজ নয়। ইংরেজরা চলে গেলেও ভারতীয়রা থাকে ও তারাই রাষ্ট্র চালায়। রাষ্ট্রকেই উৎখাত করতে হবে এটা গান্ধীপূর্ব কংগ্রেসের

পলিসি ছিল না। এটা আমরা মডারেটদের মুখে বা এক্‌স্‌ট্রিমিস্টদের মুখেও শুনিনি। শুনিনি যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয় তাঁদের মুখেও। এটা গান্ধীজীর মুখেই শোনা। তাঁর মৌল আপত্তি বিদেশী কর্তৃত্বে নয় যে সিস্টেম তারা গড়ে তুলেছে তারই অস্তিত্বে। সেটা নির্জলা মন্দ। স্বদেশী কর্তৃত্ব হয়তো অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। কিন্তু মন্দত্বের জড় তাতে মরে না। যেমন মিলের কাপড়ে মরে না। তাদের গড়া সিস্টেমটাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। যাতে তার সাহায্যে মানুষ মানুষকে উৎপীড়ন না করে, শোষণ না করে। এক্ষেত্রে লেনিনের উদ্দেশ্য আর গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়। উদ্দেশ্য একই, কিন্তু উপায় বিভিন্ন। আর উপায় বিভিন্ন বলেই একজনের ধ্যানের রাষ্ট্র প্রোলিটারিয়ান রাষ্ট্র আরেকজনের ধ্যানের রাষ্ট্র ননভায়োলেন্ট রাষ্ট্র। গান্ধীজী কোনো দিন শাসনকার্য করেননি, আমি করেছি। করার আগেও আমার ধারণা ছিল যে ননভায়োলেন্ট রাষ্ট্র সম্ভব, কিন্তু করার পরে আমার ধারণা বদলায়। কম ভ-য়োলেন্ট রাষ্ট্র হতে পারে, ননভায়োলেন্ট রাষ্ট হবার নয়। তার জন্যে চাই সত্যি সত্যি স্বর্গরাজ্য। মানবপ্রকৃতির গভীরতম রূপান্তর। আমি বিবর্তনবাদী। বিবর্তন সূত্রে মানব হয়তো হিংসা-প্রতিহিংসার উর্ধ্বে উঠবে। কতক লোককে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে, দুঃখবরণ করতে হবে। অধিকাংশ লোককে শিক্ষিত হতে হবে। চলতি অর্থে নয়। হঠাৎ একটা গণসত্যাগ্রহ বা একটা বিপ্লব এসে পথসংক্ষেপ করতে পারে, তবু রাষ্ট ওইটুকতেই শুকিয়ে যাবে না। তার সেবা করবে সেই আর্মি, সেই পুলিশ, সেই কোর্ট, সেই জেল।

শিল্পী টলস্টয় ব্যর্থ হননি। ঋষি হবার পরেও লিখেছেন 'রেজারেকশন', তৃতীয় মহত্তম উপন্যাস। অন্তত গোটা দুই অবিস্মরণীয় গল্প, 'প্রভু ও ভৃত্য' আর 'আইভান ইলিচের মৃত্যু'। কিন্তু ঋষি টলস্টয় না পারলেন মহাযুদ্ধ ঠেকাতে, না পারলেন মহাবিপ্লব এড়াতে। একটার লজিকাল পরিণতি অপরটা। বিরাশি বছরে দেহত্যাগ না করে আরো সাত বছর বেঁচে থাকলে দেখে যেতেন তাঁর ব্যর্থতার দৃশ্য। কিন্তু আরো তিন বছর টিকে থাকলে দেখতেন গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের অহিংস অভিযান। তাঁরও পরোক্ষ সার্থকতা।

শিল্পী টলস্টয় ও ঋষি টলস্টয়, একজন মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় না। 'সমর ও শান্তি' লেখার বয়সেও তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও বিবেকের তাড়না যথেষ্ট প্রবল ছিল। 'আনা কারেনিনা' লেখার বয়সে আরো তীব্র হয়। তাঁর সাংসারিক সাফল্যের চূড়ায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে মানব জীবনের অন্বিষ্ট যশ নয়, বিভব নয়, মানসম্মান নয়, রাজক্ষমতা নয়, ভোগবিলাস

নয়। মৃত্যু অপেক্ষা করছে তার আত্মাকে এক অজানা লোকে নিয়ে যেতে, যেখানে সে নিঃসম্বল। কিংবা সে একেবারেই অস্তিত্বহীন। পরপারে অন্তঃহীন শূন্যতা। করণীয় তাহলে কী? যিশু যা বলে গেছেন, ঈশ্বরকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা। ভালোবাসা যদি সত্য হয় তবে হত্যা করা কখনো সত্য নয়, কোনো কারণেই শ্রেয় নয়, শোষণ করা কখনো সত্য নয়, কোনো কারণেই শ্রেয় নয়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা দিচ্ছে এর বিপরীত শিক্ষা, খ্রিস্টীয় শিক্ষার সঙ্গে সে সভ্যতার মূলেই বিরোধ। খ্রিস্টধর্মে যারা বিশ্বাস করে তারা সে সভ্যতায় বিশ্বাস করতে পারে না। সে সভ্যতায় যারা বিশ্বাস করে তারা খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করতে পারে না। খোসাটা আসল নয়, শাঁসটাই আসল। খাঁটি খ্রিস্টান হতে হবে। খাঁটি খ্রিস্টানের সঙ্গে খাঁটি বৌদ্ধের বা খাঁটি মুসলমানের বা খাঁটি হিন্দুর মূলত কোনো ভেদ নেই। গান্ধীজীকে তিনি তাঁর সমর্থন জানিয়ে, উৎসাহ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চিঠি লেখেন সে চিঠি পৌঁছয় তাঁর মৃত্যুর পরে। বলতে গেলে সেই তাঁর শেষ উইল ও টেস্টামেন্ট। পার্থিব বিষয়-সম্পত্তির নয়, জীবনের বাণীর ও ব্রতের। গান্ধীজীকে লেখা সে চিঠি দেশ ও ধর্মনির্বিশেষে সব মানুষেকেই লেখা। যারা বর্তমান সভ্যতার মিথ্যা মূল্যগুলোর মোহে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট।

শিল্প কি কেবল শিল্পকেই সার করবে, মানবজাতির জীবন-মরণের সমস্যা নিয়ে ভাববে না, সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাবে না? এ বিষয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে আমার মতভেদ আজীবন। তাজমহল গড়ার কাজও কতক মানুষকে করতে হবে। চারদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্মে তৎপর থাকতে হবে, তন্ময় থাকতে হবে। শিল্পের দেবী ঈর্ষাপরায়ণা। সব মানুষের কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে কতক মানুষের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এরা যদি না করে তো আর কেউ করবে না। শিল্পীরা তাদের স্বধর্ম নিয়েই থাকবে, সেটাও ধর্ম।

টলস্টয় গ্রামে বাস করতেন, চাষী ও কারিগরদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সেই পথ দিয়ে তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করত, সন্ন্যাসী ফকির জিপসিদেরও আসা-যাওয়া ছিল। এই যে চিরন্তন স্বদেশ একে ছেড়ে তিনি বিদেশেও যেতেন না, দু'বার গিয়ে অস্বস্তি বোধ করে অল্পদিনের মধ্যে ফিরে আসেন। তাঁর এই বিদেশবিমুখতার সঙ্গে যোগ দেয় নগরবিমুখতা। নগরগুলো তো বিদেশেরই অনুকরণ। সেখানে গেলেও তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে তাঁকে মস্কোতেও বাসা নিতে হয়েছিল। বছরের কয়েক মাস সেখানে কাটাতেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় জুড়ে থাকত ইয়াসনাইয়া পলিয়ানায়।

রবীন্দ্রনাথের যেমন শান্তিনিকেতনে। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই মস্কোতে বা সেন্ট পিটার্সবার্গে। অনেকে প্যারিসে বা দক্ষিণ ফ্রান্সে বা ইতালিতে বা জার্মানিতে। টলস্টয় এঁদের দেখতে পারতেন না, তাঁর ধারণা দেশের লোকের নাড়ির সঙ্গে এঁদের যোগ নেই, এঁরা লিবারল হলেও শৌখিন লিবারল, বিপ্লবী হলে পুঁথি পোড়ো বিপ্লবী। লিবারলদের মুখে যখন ব্যক্তি স্বাধীনতার বা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের খৈ ফুটত তখন তিনি বলতেন, যুদ্ধকালে কনসক্রিপশন কী করে তার সঙ্গে খাপ খায়? যারা রাষ্ট্রের হুকুমে নরহত্যা করে তারা তো তাদের বিবেক হারিয়ে বসেছে। রাষ্ট্রের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। পশ্চিম থেকে যন্ত্র আমদানি করে তার পায়ে আত্মা বলি দিলে সেটাও তেমনি মারাত্মক। চাষী আর কারিগরকে কলমজুর বানিয়ে প্রগতি হবে, এটা মায়া।

তাঁর সমাধান ছিল চাষীকে আপনার বলতে একটুকরো জমি দিতে হবে, যেখানে চাষীরই মালিকানা। জমিদারেরও নয় রাষ্ট্রেরও নয়। দেশের বুদ্ধিজীবী মহল তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাই বুদ্ধিজীবীদের ওপরে ছিল তাঁর অবজ্ঞা। তা ছাড়া কেইবা তাঁর মতো জমিতে গিয়ে চাষবাস করতে রাজি? তাহলে তো আর বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হবেন না। বুদ্ধিজীবীকে তিনি বানাতে চান চাষী। ওঁরা কিন্তু চাষীকে বানাতে চান বুদ্ধিজীবী। রাষ্ট্রের সঙ্গে, চার্চের সঙ্গে, শিল্পীদের সঙ্গে, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মতবিরোধেই কেটে যায় তাঁর শেষজীবন।

পরিবারের সঙ্গেও তেমনি। গৃহত্যাগ করে তিনি কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পথের ধারে এক রেলস্টেশনে ঘটে দেহত্যাগ। সব দেশের মানুষ তাঁর জন্যে কাঁদে, সব শ্রেণীর মানুষও। একমাত্র তুলনা গান্ধীজীর নিধন।

(১৯৭৮)

টলস্টয় : সার্ধশতবার্ষিকী

টলস্টয়ের জন্মের দেড়শো বছর অতীত হয়েছে। তাঁর জীবনকালেই তিনি দেশের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় দেখা গেল, স্বদেশে পূজ্যাতে 'জার', টলস্টয় সর্বত্র পূজ্যাতে। তাঁর জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে সারা দুনিয়ার লোক উৎকণ্ঠিত। কেন এত শ্রদ্ধা, এত প্রীতি, এত মমতা? 'সমর ও শান্তি', 'আনা কারেনিনা' ও 'রেসারেকশন' এই তিনটি মহান উপন্যাসের জন্যেই কি? না তাঁর মানবদরদি জীবনদর্শনের জন্যে, জনদরদি জীবনযাপনের জন্যে? যুদ্ধবিরতি ও শোষণবিরতির জন্যে তাঁর অবিশ্রান্ত লেখনীচালনার জন্যে?

টলস্টয়ের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ষোল বছর বয়সে, যখন আমি স্কুলের ছাত্র। তাঁর কাহিনীগুচ্ছ পুরস্কার পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করি গোটা দুই। একটি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে। সেই যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো সে সম্পর্ক সারা জীবনেও ছিন্ন হলো না। জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে আমি তাঁর অনুচরদের সঙ্গেই রয়েছি। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে উঠেছি। আর্টকে তিনি পঞ্চাশোত্তর বয়সে ধর্মপ্রচার বা নীতিপ্রচারের বাহন করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার মৌল মতভেদ। আমার মতে এতে আর্টের স্বাধীনতা খর্ব হয়। অমিতাচারী আর্টকে সংযত হতে বলা এক জিনিস, শৃঙ্খলার খাতিরে শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া আরেক। শিবের জন্যে সৌন্দর্যকে লাঘব করা যায় না। সত্যের জন্যেও না, তবে দ্বন্দ্বের দিন আমি দ্বিধান্বিত। ঠিক এই কারণেই আমি রবীন্দ্রনাথের আরো কাছাকাছি। পরবর্তী বয়সে আমি কবির প্রভাবও কাটিয়ে উঠেছি।

এ সংসারে ধনহীনরা ধনবান হতে চায়, বলহীনরা বলবান হতে চায়, অশিক্ষিতরা শিক্ষিত হতে চায়, নিম্নস্থানীয়রা উচ্চস্থানীয় হতে চায়। কিন্তু এর বিপরীত অভিলাষ কেউ কোথাও পোষণ করে কি? যদি কেউ করে সে সরাসরি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, মঠে যোগ দেয় কিংবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। টলস্টয়

দীনহীনদের একজন হয়ে তাদেরই মতো শ্রমলব্ধ অন্নে প্রাণধারণ করতে চেয়েছিলেন, পশুবলে তাঁর আস্থা ছিল না, বুদ্ধিজীবীদের ওপর তাঁর অবজ্ঞা জন্মেছিল, সভ্যতার ওপরে তিনি বীতরাগ। অথচ সন্ন্যাসীও হননি, মঠেও যোগ দেননি, আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেননি। গান্ধীজী তবু তাঁর সহধর্মিণীকে আশ্রমিকা করতে পেরেছিলেন, টলস্টয়ের সহধর্মিণী শেষপর্যন্ত অভিজাত ঘরণী। ঘর ছাড়তে যাওয়া মানেই ঘরণীকে ছাড়তে যাওয়া। সেই কাজটি যেদিন করতে সমর্থ হন সেদিন তিনি হন অভিজাত জীবনধারা থেকে মুক্ত পুরুষ। কিন্তু ততদিনে তাঁর বয়স হয়েছে বিরাশি, শরীর ভেঙ্গে গেছে, দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি পথের ধারে এক রেলস্টেশনে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেঁচে থাকলে আবার তাঁকে তাঁর ঘর-সংসারেই ফিরে যেতে হতো। সেটা হতো তাঁর পক্ষে পরাজয়। যদি না তাঁর সহধর্মিনীর ঘটত একপ্রকার অন্তঃপরিবর্তন। যদি না সমস্ত গৃহস্থালিটাই বনে যেত ঋষি ও ঋষিপত্নী তথা ঋষিসন্ততিদের আশ্রম। একটি কি দুটি কন্যা ভিন্ন আর কোনো পুত্র-কন্যার ওপরে তাঁর জীবনদর্শনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি। তাঁরা তাঁদের দেশের ও তাঁদের যুগের আর দশজন উচ্চবংশীয়ের মতো। তাঁদের তিনি মানাতে পারেননি যে স্বেচ্ছায় ধনসম্পদ ও অলস জীবনধারা ত্যাগ না করলে বিপ্লবের দিন বাধ্য হয়েই সর্বস্ব হারাতে হবে। তখন বিদেশে গিয়ে পিতার গ্রন্থ-স্বত্বের দৌলতে ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে।

ঋষি যেখানে নিজের ঘরের লোককেই সঙ্গে নিতে পারলেন না সেখানে সারা দেশের লোককেইবা সঙ্গে নিতে পারবেন কেমন করে? সে কাজের ভার পড়ল লেনিনের ওপরে, ভার দিল ইতিহাস। লেনিনেরও নিঃস্বার্থ জীবন, সাধারণের মতো জীবনযাত্রা। কিন্তু জনগণকে সঙ্গে নেবার জন্যে কী পরিমাণ রক্তপাত করতে হলো তাঁকে! পরে তাঁর পটশিষ্য স্টালিনকে। রক্তের স্রোতে ভেসে গেল 'সমর ও শান্তি' তথা 'আনা কারেনিনা' তথা 'রেজারেকশনে'র বুদ্ধিদীপ্ত বলদৃপ্ত ধনসম্পদশালী অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু তাতে তাদেরইবা লাভ কী হলো যাদের মধ্যে টলস্টয় ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন ছোট ছোট জোত? যেখানে যারা শোষণও করবে না, শোষিতও হবে না। স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চাষ করবে, যা ফলাবে তা খাবে, যা খাবে তা ফলাবে। শিল্পের মতো কৃষিও চলে গেছে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ক্ষেত-খামার কারো নিজের নয়। রাষ্ট্রের কিংবা সমষ্টির। টলস্টয় দেখলে কষ্ট পেতেন। কিছুতেই তাঁকে বুঝানো যেত না যে এরই নাম সামাজিক ন্যায়। পশ্চিমের লোক যাকে গণতন্ত্র বলে তাতে তো তিনি বিশ্বাসই করতেন না, সুতরাং সে জিনিস গড়ে ওঠেনি দেখে তিনি কাকেইবা দোষ দিতেন? এক ডিকটেটরশিপের বদলে

আরেক ডিকটেটরশিপ। অভিজাতদের না হয়ে শ্রমিকদের। সমাজের এক মেরুর না হয়ে অপর মেরুর। টলস্টয় প্রচারিত অহিংসার নামগন্ধ নেই। সত্যেরও আছে কি না সন্দেহ। কাউকে তো কিছু প্রাণ খুলে লিখতেই বা বলতেই দেওয়া হয় না। কড়া সেনসরশিপ।

টলস্টয়ের অহিংস মতবাদ কেবল যে যুদ্ধবিরোধী ছিল তাই নয়, বিপ্লববিরোধীও ছিল। বিপ্লব যে অহিংস হতে পারে এ বিশ্বাস তাঁর কিংবা কারো ছিল না। রাশিয়াতে কেবল যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছিল তা নয় বিপ্লবের প্রস্তুতিও চলেছিল। যেন একটা অন্যটার উল্টো পিঠ। যুদ্ধবাজরা টলস্টয়কে মনে করতেন দেশের শত্রু। আর বিপ্লববাদীরা মনে করতেন শ্রেণীর শত্রু। খ্রিস্টীয় ধর্মসঙ্ঘও তাঁর বাইবেলের ভাষ্যকে ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ মনে করে তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল। জনগণ যদি তাঁরই ভাষ্য মেনে নেয় তবে প্রচলিত ধর্মের সংশোধন করতে হয়। কেবল ধর্মের বেলা নয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের বেলা টলস্টয়ের চিন্তা ছিল আমূল সংশোধন বা সংস্কারের পক্ষে। কিন্তু ন্যূনতম পরিবর্তনকেও রাষ্ট্রের বা চার্চের বা ধনতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের কর্তারা বিপ্লব বলে পরিহার করতেন। বিপ্লব যখন এলো তখন রাষ্ট্রকেও নিষ্ক্রিয় করল। চার্চকেও নির্ব্রাহ্মণ বা নিঃসন্ন্যাসী করল। সমাজকেও নির্বৈশ্য করল। শূদ্র হলো নিষ্কণ্টক। কিন্তু অস্ত্র হাতে সেও গড়ে তুলল রেড আর্মি। তার জয়লাভ মানে হিংসার জয়লাভ।

অথচ রাজা-প্রজা সকলেই স্বীকার করতেন যে টলস্টয় তাঁর দেশের এক নম্বর নাগরিক। ইউরোপবাসীরা বলতেন তিনি ইউরোপের বিবেক। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত গান্ধীও তাঁকে কর্মগুরু পদে বরণ করেছিলেন। একলব্যের যেমন দ্রোণ। টলস্টয়ের মহাপ্রয়াণে কে না ব্যথিত হয়েছিলেন? প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন টমাস মান বলেছিলেন টলস্টয় বেঁচে থাকলে কি তিনি এ যুদ্ধ বাধতে দিতেন? সমস্ত শক্তি দিয়ে রোধ করতেন। টলস্টয়ের সম্মান কেবল সাহিত্যিক হিসাবে নয়। মানবহিতৈষী হিসাবেও তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর সাহিত্যিক কীর্তি এখনো অদ্বিতীয়। তবে পরবর্তীকালের বিচারে ডস্টয়েভস্কির উচ্চতা বাড়তে বাড়তে তাঁর সমান হয়েছে। আর মানবনিয়তি সম্বন্ধে তাঁর যে ভাবনা তার কর্মময় অভিব্যক্তি প্রধানত গান্ধীজীর জীবনেই। তিনিও স্বাধীন ভারতে কার্যত পরিত্যক্ত।

টলস্টয়ের মহাপ্রয়াণে কারো চেয়ে কম অভিভূত হন না ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন মার্গের সাহিত্যিক ম্যাকসিম গোর্কি। গোর্কির টলস্টয়স্মৃতি আরো অনেকের মতো

আমাকেও অভিভূত করে। আমার তো মনে হয় না যে গোর্কি টলস্টয়ের প্রতি সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে কোনোরূপ অবিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সেই প্রবন্ধ পড়ে ক্ষুণ্ন হন। বলেন, "ম্যাক্‌সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলস্টয় দোষে-গুণে যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণরেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে, এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোন কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড় তা নয়, এমনকি– অনেক বিষয়ে হেয়। ... টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না এ কথা বলাই চলে না, খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু, যে সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের ও বহুকালের, তাঁর ক্ষণিক মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তাহলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী? ...ক্ষণকালের মাথার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিস্টের দেখা, একথা মানতে পারিনে। তা ছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট চিত্ত বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়, তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা যে সত্য তা কেমন করে বলব? গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহৃত করতে পারতেন তাহলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হতো। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত, আর, তবেই না যা না ভোলবার তা বড়ো হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা হত।" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি)

রবীন্দ্রনাথের লেখায় টলস্টয় প্রসঙ্গ ওর বেশি যা আছে তা কোথাও এক লাইন, কোথাও দু'লাইন। একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি টলস্টয়কে ইউরোপের বিবেক বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে একখানি চিঠিতে লিখেছেন, "Anna-Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না– এ রকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারিনে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর উদার লেখা– কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।"

গোর্কি নিশ্চয়ই এর চেয়ে কঠোর কিছু বলেননি। আমার মনে হয় গোর্কির জীবনস্মৃতিকে টলস্টয়ের জীবনচরিত বলে ভ্রম থেকেই রবীন্দ্রনাথের ওই ধারণা।

সাক্ষাৎকারের সময় গোর্কি যা শুনেছেন ও যা দেখেছেন তাই লিখেছেন, কিছুই বানাননি। সত্যকামের মতো টলস্টয়ও 'সত্যকুলজাত'।

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এবার গোর্কির লেখা থেকে দিই। ইংরেজিতে।

"Leo Tolstoy is dead...The news hit my heart. I groaned from anguish and resentment snd now, in a kind of half-madness, I imagine him the way I knew him and the way he used to look, and am racked by the desire to talk about him...I recall his piercing eyes– they saw throught everything– and his fingers, which seemed perpetually to be modelling something in the air, his talk, his jokes, his favourite muzhik words and his indefinable voice. I see how much life he had embraced and how superhumanly clever he was, and awesome,...Words are powerless to convey what I felt then, felt both delighted and fearsome and it all merged in one happy thought. 'I'm not an orphan on this earth as long as this man is alive'. ...And now I feel an orphan, and I cry as I am writing. I have never wept so disconsolately and so bitterly. I don't know whether I loved him– and what does it matter whether I loved him or hated him? The sensations and emotions he aroused in me were always immense and fantastic; even the things around him that I found unpleasant and inimical somehow did not oppress me but exploded my soul, as it were, to enlarge it and make it more sensitive."

এ লেখা একজন ভক্তের লেখা, কিন্তু অন্ধ ভক্তের নয়। ভক্তির সঙ্গে ছিল সূক্ষ্ম যুক্তি। যা দিয়ে তিনি টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করেছিলেন। সোনার সঙ্গে খাদ থাকলে যা হয় টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বেও ছিল তাই। নয়তো তিনি একজন সাধুসন্ত হতেন, একজন মুনিঋষি বা প্রোফেট। তেমন মানুষের হাতে 'সমর ও শান্তি' বা 'আনা কারেনিনা' হতো না। রবীন্দ্রনাথ যাই মনে করুন। কোন্ ধাতুতে তিনি তৈরি জানতে হলে গোর্কির সাক্ষ্য আমাদের সাহায্য করে। আবার তুলে দিচ্ছি। ইংরেজি থেকে। পথের ধারে হঠাৎ দেখা দুই তীর্থযাত্রী ও যাত্রিণীর বীভৎস মিলনের বর্ণনা দিয়ে টলস্টয় বলেছেন,

"You see what sometimes happens. Nature-which the Bogomils believe to have been created by the devil– torments man in a particularly cruel and mocking way : it takes away the strength but leaves the desire. This is the lot of all living souls. Only man is expoesd to

the shame and horror of the torment which is part of his flesh. We carry it within ourselves as an inevitable punishment, but for what sin of ours? As he spoke his eyes were changing strangely– they were now plaintive like a child's, and now shining dryly and severely. His lips twitched and his moustache bristled. When he finished his story he took a handkerchief out of his blouse pocket and wiped his face hard, although it wasdry. Then he spread his bread with the hooked fingers of his strong peasant hand and repeated quietly, `For what sin?"

গোর্কি যে ছবিখানি এঁকেছেন সে ছবি যে জীবন্ত হয়েছে এই দুটি উদ্ধৃতিই তার যথেষ্ট প্রমাণ। অসাধারণ পুরুষের সাধারণ দোষও থাকে। কথায়-বার্তায় তা ফুটে বেরোয়। কিন্তু যেটা আরো পরিস্ফুট সেটা টলস্টয়ের আপসহীন সত্যনিষ্ঠা। সত্যকে জানবার জন্যে, জানাবার জন্যে তাঁর অপরিসীম প্রয়াস। শুধু শিল্পীদের বিরুদ্ধে নয়, শিল্পের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযোগ সে সত্য কথা বলে না।

"We're all given to telling tales. Me too. I write, and suddenly feel sorry for someone and add a good trait to a character, and take away from another, so as not to make the other characters too black by comparison...That's why I say that artistry is lying, deceitful and arbitrary, and is harmful for people.You write not about life as it is but what you think of life. Who can profit from knowing how I see this tower or the sea, or a Tatar– what is the point of it who needs it?"

একথা যিনি বলতে পারেন তাঁর হয় নতুন কিছু সৃষ্টি করবার নেই, নয় নতুন কিছু সৃষ্টি করবার থাকলেও তিনি তাতে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। তিনি চান এমন কিছু লিখতে যা যিশু খ্রিস্টের কথামৃতের মতো সর্বজনহিতকর হবে, কিংবা নিম্নতম অধিকারীর কাছে সরল, সহজ ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁর লেখা আর্ট হলো কি না তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই, তিনি চান দীন-দুঃখী শোষিত পীড়িতদের সেবা করতে। সংসারে মন্দ আছে, অশুভ আছে। কিন্তু খ্রিস্টের বাণীই তাঁর বাণী। অশুভের প্রতিরোধ কোরো না। হিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিরোধ অশুভ।

গোর্কি তাঁকে যা বলেন ও তার উত্তরে তিনি যা বলেন তা ইংরেজিতে এইরকম– "I said that all writers probably made up things a little, portraying people they would like to see them; I also said that I liked active people who opposed evil by all means, including violence. 'But violence is the main evil, he exclaimed taking me by the arm."

সত্য চিরদিনই তাঁর স্বভাবে ছিল, অহিংসা এলো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর এই অহিংস মতবাদ ইউরোপ গ্রহণ করে না। কিন্তু গান্ধীজী গ্রহণ করেন ও তাঁর কর্মপদ্ধতির সূত্রে ভারতের জনগণ গ্রহণ করে। এখানে বলে রাখা দরকার যে অপ্রতিরোধ বলতে যিশু যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা নিষ্ক্রিয়তা নয়, কাপুরুষতা নয়। সেটাও একপ্রকার প্রতিরোধ, কিন্তু নৈতিক প্রতিরোধ। প্যাসিভ বলে চিহ্নিত হলেও তা হৃদয়ের ওপর অ্যাকটিভ। নয়তো যিশুর বিচারইবা হতো কেন, প্রাণদণ্ডইবা হতো কেন? টলস্টয় যে শিক্ষা যিশুর কথামৃত থেকে পান সেই শিক্ষাই দিয়ে যান তাঁর শেষবয়সের বাণীতে। সে শিক্ষা গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করে। কর্মপদ্ধতি গান্ধীজীর।

টলস্টয়ের উত্তরাধিকার একদিকে যেমন গান্ধীজীতে বর্তায় তেমনি আরেকদিকে রঁম্যা রঁলায়। টলস্টয়ের পরে রঁলাকেই বলা হয় ইউরোপের বিবেক। প্রথম মহাযুদ্ধে রঁলা ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। ফলে স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। কিন্তু মুসোলিনি ও হিটলারের অভ্যুদয়ের পর তাঁদের হিংসাত্মক মতবাদ ও কার্যকলাপ রঁলাকে এক পা এক পা করে টলস্টয়পন্থা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। রঁলা যে কেবল টলস্টয়েরই উত্তরাধিকারী ছিলেন তাই নয়। ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের নায়কদেরও উত্তরাধিকারী। তাই রুশবিপ্লবের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মার সাযুজ্য। রুশবিপ্লব ফরাসিবিপ্লবের সন্তান। তাকে নাৎসিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে সশস্ত্র প্রতিরোধই ফলপ্রদ। অহিংস প্রতিরোধ নিষ্ফল। ইউরোপের বিবেক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে দেশরক্ষার তথা বিপ্লবরক্ষার যুগ্ম প্রয়োজনে অসি ধারণ ব্যতীত অন্য পন্থা দেখতে পায় না। নীতিগতভাবে টলস্টয়পন্থতা পরিত্যক্ত হয়। টলস্টয়ের শিক্ষা ছিল, কোনো অবস্থাতেই হিংসা নয়। চার্চের শিক্ষা, রাষ্ট্রের শিক্ষা আক্রমণের মুখে হিংসা। রঁলার শিক্ষাও শেষ পর্যন্ত তাই।

মৃত্যুর পূর্বে রঁলা সুইটজারল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে ফিরে যান ও নাৎসিদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে স্বগ্রামে ও স্বগৃহে বাস করেন। তখন তিনি মগ্ন হন সঙ্গীত সাধনায়। বিশেষত বেঠোভেনের সঙ্গীতে। বেঠোভেন, গ্যেটে ও টলস্টয় এই তিনজনই ছিলেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। এঁদের মধ্যে বেঠোভেনই তাঁর কাছে অগ্রগণ্য। টলস্টয়ের প্রভাব যদিও তাঁর শিল্পকর্মের ওপর পড়েছিল তবু তার সামনে ছিল বেঠোভেনের আদর্শ আদি থেকে অন্তকাল অবধি। বেঠোভেনেও আপসহীন। কী জীবনে কি শিল্পে। রঁলার জাঁ-ক্রিস্তফ বেঠোভেনের আদলে আঁকা। রঁলা টলস্টয়ের দিকে তাকাতেন চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। 'জাঁ-ক্রিস্তফ' লিখতে লিখতে সাহিত্যে টলস্টয়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন।

কোন্‌টা রাশিয়ার পক্ষে ভালো, কোন্‌টা জনগণের পক্ষে ভালো, 'কোন্‌টা নীতির দিক থেকে ভালো, কোনটা শিল্পের দিক থেকে ভালো, এ নিয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে মতভেদের অবকাশ টলস্টয়ের জীবদ্দশাতেও ছিল, পরে তো রয়েছেই। তাঁর নিজের দেশেই তিনি এখন কুলুঙ্গীতে তোলা এক ঠাকুর। সকলেই তাঁর বন্দনা করে, কিন্তু কেউ তাঁর অনুসরণ করে না। রবিঠাকুর তাঁরই মতো একজন ঠাকুর হলেও এখনো আমরা কয়েকজন আছি যাঁরা তাঁর উত্তরপুরুষ বলে পরিচিত হই। ওদিকে কিন্তু রঁলার অনুসরণ আর কেউ করেন না। তাঁর স্বদেশে তিনি কুলুঙ্গীতে তোলা ঠাকুরও নন। কেবল তাঁর একার নয়, তাঁর সমসাময়িক প্রায় সব আদর্শবাদী সাহিত্যিকদের একই দশা। আদর্শবাদের উপরেই পাঠক সাধারণের বিরাগ। কিসে তাদের ভালো সাহিত্যিকরা সেটা নির্দেশ করতে যাবেন কেন? তারা কি শিশু? না সাহিত্যিকরা গুরুমশায়? আর ভালোরই কি কোনো সংজ্ঞা বা মাপকাঠি আছে? পাঠকের রুচি-অরুচিকে উপেক্ষা করে লেখক যদি তাঁর রুচি-অরুচিকেই ভালো বলে পরিবেশন করেন তবে পাঠকও সে উপাদেয় ব্যঞ্জন উপেক্ষা করতে পারে।

ভালো নয় বলে টলস্টয় তাঁর নিজের যেসব কীর্তিকে খারিজ করেছিলেন এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর সেইসব কাহিনীই তাঁকে অমর করে রেখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরাও পরম সমাদরে পাঠ করে 'আনা কারেনিনা'। টলস্টয়ের মতে খারাপ বই। রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্রী। কিন্তু সাহিত্যরসিকদের অধিকাংশের মতে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারো কারো মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের বিচার টলস্টয় বা রঁলা বা রবীন্দ্রনাথের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভুল। তাঁরা স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্মনিপুণ। বিচার করবেন সাহিত্যের যাঁরা জহুরী। আর সাহিত্যের যাঁরা তন্নিষ্ঠ পাঠক। সাহিত্যকে সাহিত্য বলেই ভালোবাসে। যে বই বার বার শতবার পড়েও তৃপ্তি হয় না, আবার পড়তে ইচ্ছে করে, সেই বইই ভালো বই। তেমন ভালো বইয়ের তালিকায় টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি' শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে স্বদেশে-বিদেশে সব দেশে। অবশ্য কথাসাহিত্যে। নাটকে নয়। সেখানে শেকস্‌পিয়ারের স্থান টলস্টয় পূরণ করতে পারেননি। তেমনি কাব্যেও গ্যেটের স্থান। আধুনিক সাহিত্যের কথাই বলছি। সাহিত্যের বিচারে দেশ বা জনগণ বা নীতির চেয়ে রসের ও রূপের গণনাই প্রধান। রসস্রষ্টা ও রূপস্রষ্টা টলস্টয় দেশে দেশে যুগে যুগে আদরণীয় ও বরণীয়।

(১৯৭৮)

টলস্টয় : তাঁর ট্র্যাজেডি

বিরাশি বছর বয়সেও টলস্টয় নিয়মিত ব্যায়াম করে শুতে যেতেন। সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে তিনি একখানি বই পড়ছিলেন। ডস্টয়েভস্কির মহান উপন্যাস 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'। এ যুগের যে ক'খানি বই টলস্টয়ের বিচারে আর্ট হিসাবে উত্তীর্ণ তারই একখানি। পড়তে পড়তে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় রাত তিনটে নাগাদ। তাঁর স্ত্রী শুতেন অন্য ঘরে। সে ঘর থেকে স্বামীর ঘরে এসে তিনি করছেন কী, না স্বামীর কাগজপত্রখানা তল্লাশি। টলস্টয় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকেন, জানতে দেন না যে তিনি জেগে আছেন। কাউন্টেস নিরাশ হয়ে চলে গেলে টলস্টয় শয্যাত্যাগ করেন। কন্যা আলেকজান্দ্রা ছিলেন তাঁর পরম অনুগত ও একমাত্র বিশ্বাসভাজন। তাঁকে ডেকে বলেন, 'আমি আজ এই রাত্রেই বেরিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাব স্থির নেই। কোচম্যানকে বল গাড়ি জুততে। কেউ যেন টের না পায়।'

আলেকজান্দ্রা স্তম্ভিত হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনঃস্থির করেন যে তিনিও তাঁর অথর্ব পিতার পথের সাথী হবেন। ওই অসহায় মানুষটিকে একলা ছেড়ে দেবেন না। পিতামাতার মনোমালিন্য একদিনের নয়। প্রায় ত্রিশ বছরের। যেদিন থেকে টলস্টয় ভোগ ছেড়ে ত্যাগ আরম্ভ করেছেন। তাঁর সেই ত্যাগের সাধনায় পরিবারের আর কারো সহানুভূতি বা সমর্থন ছিল না। ছিল শুধু দুটি কি তিনটি কন্যার। তাদের মধ্যে আলেকজান্দ্রা তখনো অবিবাহিতা। ইতিমধ্যে টলস্টয় তাঁর সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছেন। গ্রন্থস্বত্ব তিনি সর্বসাধারণকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, স্ত্রী তাতে বাধা দেওয়ায় ত্রিশ বছর পূর্বের বইগুলির গ্রন্থস্বত্ব স্ত্রীর জন্যে সংরক্ষিত করে পরবর্তী বয়সের রচনা জনসাধারণের হাতে তুলে দেন। কিন্তু মুশকিল বাধে তাঁর ডায়েরি নিয়ে। শেষ ত্রিশ বছরের ডায়েরির ওপর এক্তিয়ার কার? প্রকাশের ব্যবস্থা কে করবেন? ডায়েরিতে যদি এমন কিছু থাকে

যা প্রকাশ করলে পরিবারের মুখে কালি পড়বে তাহলে সেটা বর্জন করার অধিকার নিশ্চয়ই পরিবারের। বিশেষত সহধর্মিণীর। কাউন্টেসের বিশ্বাস তাঁর স্বামীর ডায়েরিতে তাঁকে সক্রেটিসপত্নী জান্তিপের মতো বদমেজাজী ও ঝগড়াটে রূপে আঁকা হয়েছে। ভাবীকালে তাঁকে নিন্দা করবে।

টলস্টয় তাঁর ডায়েরি বিয়ের আগেই তাঁর বাগ্‌দত্তাকে দেখিয়েছিলেন। তাঁর রাহুগ্রস্ত অতীতকে তিনি ঢাকা দিতে চাননি। সোনিয়া ইচ্ছা করলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারতেন। সোনিয়ার বয়স তখন আঠারো। টলস্টয়ের চৌত্রিশ। টলস্টয় যদিও তখনো 'সমর ও শান্তি' লেখেননি তবু সেই বয়সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তা বলে সোনিয়াও কম যান না। সাহিত্যচর্চা তাঁদের বংশেও ছিল। তিনিও একটু আধটু লিখতে পারতেন। টলস্টয়ের ডায়েরি পড়ে তিনি দারুণ আঘাত পেলেন ঠিকই, কিন্তু অমন সুপাত্রকে কি হাতছাড়া করা যায়? সেই বয়সের কেইবা অপাপবিদ্ধ জিতেন্দ্রিয়? সোনিয়া ডায়েরির উত্তরে পাঠিয়ে দেন এক উপন্যাস, রাতারাতি লেখা। তাতে টলস্টয়কে চিত্রিত করেন এক কুৎসিত কিমাকার প্রৌঢ় রূপে। যার চরিত্রও রূপের মতো বিকট। টলস্টয় তো মাথায় হাত দিয়ে বসেন। ভাবেন, আমি খারাপ বলে কি এত খারাপ!

যাক, বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে যায়। সুখেরও হয়। কিন্তু ডায়েরি লেখার অভ্যাস টলস্টয়ের সারাজীবনের অভ্যাস। ডায়েরি থেকেই তাঁর গল্প-উপন্যাস একে একে জন্মায়। ডায়েরি তিনি দেখতেও দিতেন স্ত্রীকে। আপত্তিকর বিশেষ কিছু থাকতও না তাতে। কুকর্ম তো আর করতেন না। কিন্তু যা লিখতেন তা খোলাখুলিই লিখতেন। স্ত্রীর মুখ চেয়ে রেখে ঢেকে লিখতেন না। সেকালের এক সঙ্গীতশিল্পীর প্রতি কাউন্টেসের আকর্ষণ তিনি সুনজরে দেখেননি। যদিও স্ত্রীর তখন বামপ্রস্থের বয়স। কাউন্টেস এর জন্যে তাঁকে ক্ষমা করেননি। তিনিও ডায়েরি লিখতেন। দেখতে দিতেন। কী জানি কেমন করে সম্পর্কটা ভিতরে ভিতরে চিড় খায়। শেষে এমন হলো যে পাশাপাশি ঘরে থেকেও তাঁরাও পরস্পরকে চিঠি লিখতেন। টলস্টয় সম্বোধন করতেন, 'বন্ধু'। কাউন্টেস মাঝে মাঝে হিস্টেরিয়াগ্রস্তের মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর ও তাঁর স্বামীর মাঝখানে অন্য কোনো নারী ছিল না। কিন্তু ছিলেন বিশেষ এক শিষ্য। টলস্টয় যাঁকে তাঁর তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারী মনে করতেন। চার্টকভ তাঁর নাম। কাউন্টেসের মতে লোকটা সুবিধাবাদী ও ভণ্ড। টলস্টয়ের মতে আদর্শবাদী ও সুযোগ্য বাণীবাহক। টলস্টয়ের অবর্তমানে যিনি তাঁর তত্ত্ব বা মতবাদ জগতের কাছে প্রচার করতে পারবেন। শেষ বয়সের ডায়েরিখানা তিনি তাঁরই হাতে দিয়ে যেতে চান। তিনিও

সে দায়িত্ব নিতে রাজি। কিন্তু কাউন্টেস জেদ ধরেন যে ডায়েরিতে কী আছে না আছে তিনি দেখবেন ও দেখেশুনে অনুমতি দেবেন বা চেপে রাখবেন। তা ছাড়া তাঁর কানে এসেছিল যে টলস্টয় একখানা গুপ্ত উইল করেছেন ও সেটা নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন। সে রাত্রে বোধহয় গুপ্ত উইলের সন্ধানেই কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা হচ্ছিল। গুপ্ত উইলটা সম্ভবত চার্টকডের অনুকূলে। সম্পত্তিঘটিত নয়, পুঁথিপত্রঘটিত। জমিদারি অনেকদিন আগে থেকেই স্ত্রীর নামে লিখে রাখা হয়েছিল। যেসব গ্রন্থ ১৮৮০ সালের আগে লেখা সেসব গ্রন্থের গ্রন্থস্বত্ব স্ত্রীর অনুকূলে হস্তান্তরিত হয়েছিল।

সম্পত্তি নিয়েও অশান্তির শেষ ছিল না। জমিদারিটা তখন টলস্টয়ের নয়, তাঁর স্ত্রীর। তিনিই দেখাশুনা করতেন। দায়-দায়িত্ব তাঁরই। চাষীরা যদি তাঁর অনুমতি না নিয়ে গাছ কেটে নিয়ে যায় তবে পুলিশ সাহেবকে চিঠি লিখে সেটা বন্ধ করতে চাওয়া কি তাঁর কর্তব্য নয়? তাঁর মতে তিনি ঠিকই করেছিলেন। পুলিশ এসে চাষীদের ধরপাকড় করে। তারা ধরে নেয় এসব টলস্টয়ের ইচ্ছায় ও জ্ঞাতসারে ঘটেছে। মুখে বলা হচ্ছে, আমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস করিনে, আমি সম্পত্তি ত্যাগ করেছি, কিন্তু আচরণ তো পুরোপুরি বিষয়ী লোকেরই মতো। স্ত্রীর বেনামিতে সম্পত্তি রক্ষা। রাস্তার মাঝখানে টলস্টয়ের ঘোড়া থামিয়ে জনা কয়েক চাষী তাঁকে যা তা বলে শাসায়। "এই বুড়ো! তুই এখনো বেঁচে আছিস। মর, মর, তুই জলদি মর। নয়তো আমরাই তোকে খতম করব।" টলস্টয় বিষম আঘাত পান। দেহে নয়, মনে। জমিদারির চাষীদের জন্যে তিনি আজীবন যা কিছু করেছিলেন তার পরিণাম কি এই! আর তাঁর সেই যে মতবাদ, সব অবস্থায় অপ্রতিরোধ, কোনো অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ের দ্বারা নয়, সেই মতবাদ কি তাঁর নিজের সহধর্মিণীই লঙ্ঘন করলেন না পুলিশকে ডেকে এনে ধরপাকড় করিয়ে? চাষীরা তো তাঁকে ভণ্ড সাধু বলে অশ্রদ্ধা করবেই। অমান্যও করবে। পুলিশের সাহায্যে তিনি মান্য হতে চান না। তিনি রাষ্ট্র জিনিসটারই বিরোধী। তিনি পুলিশ বা আদালত বা জেল বা সৈন্যসামন্ত কোনোটাই রাখতে চান না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে ভয়ের নয়, প্রেমের। ভয়ের শাসনের স্থান নেবে প্রেমের শাসন। কিন্তু তাঁর শিক্ষার সঙ্গে তাঁর আচরণের মিল কোথায়? তাঁর নিজের পরিবারেই তিনি বেখাপ। দেশ-বিদেশের লোক তাঁর দর্শন পেতে আসে, তাঁদের চোখে তিনি একজন যুগ প্রবর্তক। কিন্তু তাঁর আপন জনকেই তিনি বোঝাতে পারেন না যে শোষিত শ্রেণীর শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত অভিজাত জীবন প্রেয় হলেও শ্রেয় নয়। শ্রেয় হচ্ছে শ্রমিকদের শ্রমের অংশ

নেওয়া, কৃষক হওয়া। শ্রেয় হচ্ছে শস্ত্রের দ্বারা অপরকে দাবিয়ে না রাখা, প্রেমের দ্বারা অপরকে বশ করা। শ্রেয় হচ্ছে দেশের শত্রুকেও মিত্রে পরিণত করা, তার মার ফিরিয়ে না দেওয়া, স্বেচ্ছায় অস্ত্রত্যাগ করা। এসব টলস্টয়ের মৌলিক বাণী নয়, যিশুর বাণীরই প্রতিধ্বনি। চার্চ এ পথের থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তিনি চান বিচ্যুতির সংশোধন করতে।

স্কুলে পরীক্ষায় সফল হয়ে আমি যেমন টলস্টয়ের 'টোয়েন্টি-থ্রি টেলস' পুরস্কার পেয়েছিলুম তেমনি পেয়েছিলুম বানিয়ানের আরো বিখ্যাত বই 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস'। তার এক জায়গায় ছিল নায়কের উক্তি–

"O! My dear wife and you, the children of my bowels, I, your dear friend, am in myself undone, by reason of a burden that lieth hard upon me. Moreover, I am for certain informed that this our city will be burned with from haven; im which fearful overthrow both myself, with these my wife, and you my sweet babes, shall miserably come to ruin, except (the which yet I see not) some way of escape can be found whereby we may be delivered." পরিবারের প্রতি টলস্টয়ের বক্তব্য তারই অনুরূপ। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে যুদ্ধ আসছে, বিপ্লবও আসছে, ধ্বংস হয়ে যাবে তাঁর পরিবার, তাঁর আত্মীয়স্বজন, তাঁর শ্রেণী, তাঁর সমাজ, তাঁর চার্চ, তাঁর রাজবংশ। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় সময় থাকতে আমূল পরিবর্তন। যে পরিবর্তন স্বতঃপ্রণোদিত। যার সূচনা নিজের জীবনযাত্রায়, স্ত্রীপুত্রকন্যার জীবন-যাত্রায়।

ইচ্ছা করলেই তিনি তাঁর আপনার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন, কিন্তু পরিবারের আর সকলের আমূল পরিবর্তন কি এতই সহজ? তা ছাড়া মদ্য মাংস তামাক বর্জন করা এক জিনিস, পত্নীসঙ্গ পরিহার করা আরেক। বাহান্ন বছর বয়সী। পুরুষের নিবৃত্তিমার্গ ছত্রিশ বছর বয়সী যুবতীর প্রবৃত্তিমার্গের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপরীতের ওপর বিপরীত কি একতরফা চাপানো যায়? তেমন সিদ্ধান্ত কি এককভাবে নেওয়া যায়? চাই দু'পক্ষের সম্মতি। যতদিন সেটা সম্ভব করতে গেলে যা হয় তার নাম সেক্স ওয়ার। ক্লাস ওয়ারের চেয়ে কম তীব্র নয়। একপক্ষ ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়ে অপরপক্ষকেও দগ্ধায়। সংসারে সেটা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। অশান্ত সংসার থেকে মুক্তি পেতে হলে সংসারত্যাগই প্রশস্ত।

কিন্তু সেরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে টলস্টয়ের বিবেকের আপত্তি। পতিব্রতা পত্নীকে কোনো কারণেই ত্যাগ করা যায় না। ত্যাগ করলে পরে স্ত্রী

যদি পাপ করে তবে স্বামীও হবে তার পাপের জন্যে দায়ী। এই হলো খ্রিস্টীয় শিক্ষা। সত্য ও অহিংসার পথে একলা চলা যায়, কিন্তু ব্রহ্মচর্যের পথে যদি ডাক শুনে কেউ না আসে তবে 'একলা চল রে' বলে এগিয়ে গেলে মন ভেঙে যায়, ঘর ভেঙে যায়, পরে আর জোড়া লাগে না। টলস্টয় এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। গৃহত্যাগের চিন্তা কি কখনো কখনো উদয় হতো না তাঁর মনে? কিন্তু সে বয়সে গৃহত্যাগ মানেই তো দেহত্যাগ। কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজবেন, সেবা করবে কে, শুশ্রূষা করবে কে, এসব প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে উদয় হতো। অথচ পরিবারের আর দশজনের মতো ঐশ্বর্যের মধ্যে অভিজাত মানের জীবনযাপন করে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা আভ্যন্তরিক বিপ্লবের হাত থেকে পরিত্রাণ মেলে না। আর চার বছর বেঁচে থাকলে তিনি যুদ্ধের সাক্ষী হতেন। আরো তিন বছর বেঁচে থাকলে বিপ্লবের সাক্ষী। অমন সুনিয়ন্ত্রিত যাঁর জীবন তিনি যথাস্থানে থেকে পরিবারের সেবাযত্নে ও নিজস্ব চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নব্বই বছর বাঁচলে আশ্চর্যের বিষয় হতো না। সম্ভবত তিনি যুদ্ধের বা বিপ্লবের জীবন্ত সাক্ষী হতে চাননি। তার আগেই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করতে অধীর হয়েছিলেন। দৈবাৎ একটা উপলক্ষ জুটে গেল মধ্যরাত্রে তাঁর কাগজপত্রে অন্যায় হস্তক্ষেপে। উটের পিঠে শেষ কুটো। টলস্টয় স্ত্রীকে জাগালেন না, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন না। আর যারা ছিল তারাও রইল ঘুমিয়ে। গৌতমের মতো তাঁর এই গৃহত্যাগেও সহায় ছিল এক বিশ্বস্ত অনুচর। তাঁর কোচম্যান। তফাতের মধ্যে সহযাত্রী ছিল তাঁর অনুগতা কন্যা আলেকজান্দ্রা।

রেলস্টেশনে পৌঁছে তিনি কোচম্যানকে বিদায় দেন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় অপরিচিতদের সঙ্গে অপরিচিতের মতো ভ্রমণ করেন। নিরুদ্দেশ যাত্রা। বোধহয় অসুখ নিয়েই রওনা হয়েছিলেন। পথের মাঝখানে অসুখটা বেড়ে যায়। কেউ কেউ চিনতে পারে যে উনি মহামতি টলস্টয়। কাগজে ওঁর ফোটো কে না দেখেছে? ওঁকে পথের ধারে এক অখ্যাত স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। খবরটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন ইয়াসনায়া পোলিয়ানাতেও পৌঁছয়। সেই প্রথম তাঁর স্ত্রী জানতে পান টলস্টয় কোথায়। স্বামী সন্দর্শনে যান। কিন্তু এমনি তাঁর দুর্ভাগ্য যে চিকিৎসকরা কেউ তাঁকে রোগীর ঘরে যেতে দেন না, পাছে রোগী তাঁকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনিও অপরাধী বোধ করে নিরস্ত হন। দিনমান বাইরে ঘোরাঘুরি করে কাটান, রাত্রে রেললাইনের সাইডিং-এ রাখা ট্রেনের একটি কামরায় ঘুমোন। শেষে যখন টলস্টয়ের অজ্ঞান অবস্থা তখন স্ত্রীকে তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হয়।

তিনি হাতে চুমু খেয়ে কানে কানে বলেন, 'ক্ষমা করো'। টলস্টয় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। ঘণ্টা দুই পরে মহাপ্রয়াণ। তাঁর জ্ঞান ফেরে না।

গৃহত্যাগ না করলে টলস্টয় আরো কিছুদিন বাঁচতেন আমার এ অনুমান অযথা নয়। কিন্তু যুদ্ধ দেখবার জন্যে আরো চার বছর ও বিপ্লব দেখবার জন্যে আরো তিন বছর বেঁচে থাকতেন এটা আমার বাসনা মেশানো চিন্তা। তিনি গৃহত্যাগ করেন ১৯১০ সালের ২৪শে অক্টোবর, দেহত্যাগ করেন ৭ই নভেম্বর। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত গান্ধীজী তাঁর যে পত্র পান সেটি তাঁর গৃহত্যাগের পূর্বে লেখা। তাতেই তিনি তাঁর মৃত্যুর সান্নিধ্যের কথা বলেছিলেন।

"The longer I live, and especially now, when I feel the nearness of death, I want to tell others what I feel so particulary clearly and what to my mind is of great importance...namely that which is called 'passive Resistance' but which is in reality nothing else than the teaching of love uncorrupted by false interpretation... therfore, your activity in the Transval, as it seems to us, at this end of the world, is the most essential work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but of all the world, will unavoidably take part."

এক হিসাবে এই চিঠিখানিই তাঁর শেষ উইল। যাঁর অনুকূলে সম্পাদিত তিনি প্রকৃতই উত্তরাধিকারী। তিনি চার্টকভ নন, তিনি গান্ধী। কাউন্টেস তাঁর নাম পর্যন্ত জানতেন না। টলস্টয়ের শেষ জীবনের ব্রত গান্ধীর দ্বারাই উদ্‌যাপিত হয়। গান্ধীজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্যাসিভ রেজিস্টান্স হয় সত্যাগ্রহ। সেক্ষেত্রেও তার মূল প্রেরণা প্রেম। সত্যাগ্রহী তার প্রতিপক্ষকে ভালোবাসা দিয়ে আপনার করতে চায়। তবে সে ভালোবাসা দ্বান্দ্বিক ভালোবাসা। নির্দ্বন্দ্ব নয়। তাই তাতে দুঃখ আছে। মৃত্যুও যে নেই তা নয়। অশুভ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বের মাঝখানেই গান্ধীজীর মৃত্যু হয়।

টলস্টয়ের গৃহত্যাগকে তাঁর দেহত্যাগের হেতু ধরে নিয়ে দোষটা গিয়ে পড়ে দুঃখিনী সহধর্মিণীর ওপরে। সেটা কিন্তু কাউন্টেসের প্রতি অবিচার। সোনিয়া ছিলেন সকল প্রকারেই পতিব্রতা, কিন্তু কেবল একটি অর্থে নয়। পতির ব্রত তাঁর নিজের ব্রত ছিল না। তিনি বুঝতেই পারতেন না অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে সম্পত্তি বিসর্জন কেন একান্ত জরুরি। গাছ লাগাবেন জমিদার, গাছ কেটে নিয়ে যাবে প্রজা, এটা কি ন্যায় না অন্যায়? বই লিখবেন গ্রন্থকার, মুনাফা লুটবে যে কোনো

প্রকাশক, এটা কি ন্যায় না অন্যায়? জমিদার তাহলে বাঁচবেন কী খেয়ে? গ্রন্থকারইবা খাবেন কী?

ভদ্রমহিলাকে বোঝানো শক্ত যে জমিদারি চাল বজায় রাখতে হলে শোষণের আশ্রয় নিতে হয় আর শোষণ অব্যাহত রাখতে হলে ভায়োলেন্স অপরিহার্য। তার মানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব। শ্রেণী-দ্বন্দ্বে জমিদারের জয় তখনি সুনিশ্চিত যখন রাষ্ট্র তার মুঠোর মধ্যে। তার মানে রাষ্ট্র যখন স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের শাসনাধীন। এ ব্যবস্থা দিকে দিকে যুদ্ধ ডেকে এনেছে ও আনতে যাচ্ছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিপ্লব। একথা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সত্য প্রকাশ করাই সাহিত্যিকদের কর্তব্য। আর তিনি যদি মনে করেন যে এটা তাঁর জীবনব্রত তবে এটাকে জীবিকার পর্যায়ে নামিয়ে আনলে ব্রতসিদ্ধি হয় না, হয় কিঞ্চিৎ অর্থলাভ। শেষ বয়সে টলস্টয়ের জীবনব্রত বা মিশন ছিল সত্য প্রকাশ তথা সত্য প্রচার। তিনি এক প্রকার মিশনারি। মিশনারিরা কি যিশুর কথামৃত বিক্রি করে বেড়ান? করলে ক'জন কিনবে ও পড়বে? তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে গেলে খুব সাদাসিধে ভাবে থাকতে হবে। অভিজাতদের মতো নয়।

এককালে লেখার জন্যে সবচেয়ে চড়া দাম হাঁকতেন টলস্টয় ও টুর্গেনিভ। দুই জমিদার। এ নিয়ে ক্ষোভ ছিল তাঁদের সমকক্ষ ডস্টয়েভস্কির। তিনি লিখেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে 'আনা কারেনিনা' প্রসঙ্গে– "কাল পড়লুম (তুমি বোধহয় আগেই শুনেছ) যে, লিও টলস্টয় তাঁর উপন্যাস, চল্লিশ কিস্তি, বিক্রি করেছেন 'রাশিয়ান মেসেনজারকে'। প্রকাশ শুরু হবে আগামী জানুয়ারি থেকে। দাম কিস্তি পিছু পাঁচশো রুবেল। অর্থাৎ মোট বিশ হাজার রুবেল। আমাকে তো ওরা আড়াইশো রুবল দিতেও ইতস্তত করেছিল। হুঁ, ওরা আমাকে হীনমূল্য মনে করে, লেখাই আমার জীবনোপায় কিনা।" এ অভিযোগ যুক্তিযুক্ত। জমিদার হলে তাঁরও দরাদরি করার জোর বাড়ত। তবে অমন লেখা জমিদারের হাত দিয়ে হতো কি না সন্দেহ।

'আনা কারেনিনা'র পর আর্ট সম্বন্ধে টলস্টয়ের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়। নিজের ওপরেই তিনি বীতশ্রদ্ধ হন এই বলে যে তিনি টাকার জন্যে লিখছেন। ডস্টয়েভস্কির উপরেও তাঁর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু পরে তিনি হিসাব করে দেখেন যে প্রকৃত আর্ট-পদবাচ্য রচনা যে কয়টি উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ডস্টয়েভস্কির কোনো কোনো লেখা। যেমন, 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'। গৃহত্যাগের প্রাক্কালে সেই বইখানিই হাতে নিয়ে তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। পাঠ বোধহয় অসমাপ্ত থেকে যায়। কিন্তু সেই তাঁর জীবনের শেষ অধ্যয়ন।

কাউন্টেস অনেকদিন আগেই লক্ষ্য করেছিলেন যে টলস্টয় আর এ জগতের লোক নন। তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে ও তাঁর চেহারায় একটা অতিমর্ত্য আভা ফুটে উঠছে। তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলির সুর কী করুণ। কোথাও অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। দেশ-বিদেশের বড়ো বড়ো মাথা যাঁর কাছে নত হয়, যাঁর কীর্তি মানবজাতিরও কীর্তি; যাঁর উচ্চতা মানবাত্মার উচ্চতা সেই টলস্টয় ক্রমাগত আত্মপরীক্ষা ও আত্মনিগ্রহ করতে করতে তাঁর সহজাত অহঙ্কারকে জয় করেছেন। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর তপস্যা প্রায় সমাপ্ত। সে তপস্যা রেজারেকশনের। ঐ নামের উপন্যাসে যার তাৎপর্য নিহিত।

সহজভাবেই তাঁর প্রয়াণ ঘটত, আরো মাস খানেক বা বছর খানেক বাদে, যদি না তাঁর স্ত্রীর অনধিকার হস্তক্ষেপ তাঁকে গৃহত্যাগের প্রবর্তনা দিত। কাউন্টেসকে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনার একটা সুযোগও দিলেন না। বিদায় তো নিলেনই না। গোপন রাখলেন তাঁর গতিবিধি। কাজটা কি নীতিসম্মত হলো? তাঁর মতো সত্যসন্ধ পুরুষের পক্ষে সেটাও কি তাঁর স্ত্রীর গোপন প্রবেশের চেয়ে কম গর্হিত? কিন্তু এর থেকে প্রমাণ হয় যে টলস্টয়ও মানুষ। তাঁর আচরণও মানুষেরই মতো। তাঁর ট্র্যাজেডি হিউমান। নাটকীয়ভবে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগও নাটকীয়।

টলস্টয়ের বিয়োগে যে বিশ্বব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস ওঠে তার কোনো নজির নেই। পরবর্তীকালে তার একমাত্র তুলনা মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবে বিশ্বময় শোকাবেগ। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" টলস্টয় রুশ ভাষায় লিখলেও সব দেশের জন্যে লিখেছেন। স্বকালের কথা লিখলেও সব কালের জন্যে লিখেছেন। কতক মানুষের কাহিনী লিখলেও সব মানুষের জন্যে লিখেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের কাছে পর নয়, বিদেশী হলেও আমাদের কাছে আপন। তাদের সুখ-দুঃখ আমাদেরও সুখ-দুঃখ। পুরাতন হলেও তারা কালজয়ী।

তবে যুদ্ধ আর বিপ্লব দুটোই ঘটে যাবার পরে টলস্টয়ের মতবাদের আর সে প্রাসঙ্গিকতা নেই, যেটা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের ও প্রথম সমাজবিপ্লবের পূর্বে। সে মতবাদের অনুসরণ যদি কেউ জীবনে করতে চান করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তার অনুসরণ তেমন সৃষ্টিশীল হবে না। তাঁর নিজের সার্থক সৃষ্টিও তাঁর আর্ট বিষয়ক তত্ত্ব অনুসরণ করেছে বলেই সার্থক হয়েছে তা নয়। হয়েছে তাঁর সত্য দৃষ্টি বা রসানুভূতির জন্যেই। সাংসারিক অর্থে সফল হয়েছে কি না অবান্তর।

(১৯৭৮)

বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অবজ্ঞা

দু'বছর আগে কলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে পাই ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শীর্ষে 'রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অবজ্ঞা'। 'স্টেটসম্যান' সেটি উদ্ধার করে 'লন্ডন টাইমস' থেকে। লেখাটি 'টাইমস' পত্রিকার সাতটি কলম জুড়ে ছিল। আর বিশ্বময় প্রচারিত হয়েছিল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পুরোটা পুনঃপ্রকাশিত হয়নি। যেটুকু বেরিয়েছে সেটুকু ভগ্নাংশ।

বুদ্ধিজীবী বলতে টলস্টয় যাঁদের বোঝেন তাঁরা হলেন অভিজাত, বণিক, রাজকর্মচারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিল্পী, ছাত্র, উকিল। এঁদের তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত, মতবাদের দিক থেকে যাঁরা লিবারল। দ্বিতীয়ত, যাঁরা সোশিয়াল ডেমোক্রাট। তৃতীয়ত, যাঁরা বিপ্লববাদী। লিবারলদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য দেশের অধিকাংশ লোক চাষী, অথচ সেই চাষীদের সঙ্গেই তাঁদের সম্পর্ক কেটে গেছে। তাঁদের দৃষ্টি কেবল সরকারের অত্যাচার-অনাচারের ওপরেই নিবদ্ধ। সরকার হাজার হাজার লোককে জেলে কিংবা নির্বাসনে পাঠাচ্ছে, বিনা বিচারে আটক করছে, বই-কাগজ ছাপতে দিচ্ছে না, ছাপলে বাজেয়াপ্ত করছে, সভাসমিতি করতে দিচ্ছে না, ইউনিয়ন গড়তে দিচ্ছে না, এইসব নিয়ে লিবারলরা সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করছে, কিন্তু চাষীদের তাতে কী এলো-গেল?

আর সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা চান নির্বাচন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠন ও আইন প্রণয়ন যাতে লোকের মুক্তি তথা কল্যাণ হয়। কিন্তু চাষীদের তাতে লাভটা কী হবে? ওরাই তো জনগণের অধিকাংশ।

আর বিপ্লববাদীরা চান সরাসরি ক্ষমতা দখল করতে। ক্ষমতা দখল করে লোকের কল্যাণ করতে, তাদের মুক্তি দিতে। কিন্তু চাষীদের তাতে কতটুকু লাভ? তারা কি জমির মালিক হবে?

টলস্টয়ের নিজের সূত্র হচ্ছে প্রত্যেক চাষীরই আপনার বলতে একখণ্ড জমি থাকা চাই। যার ওপর তার নিজের স্বত্ব। আর কারো নয়। সরকারেরও নয়। যতক্ষণ না এই মূল সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই কিছু হবে না।

টলস্টয়ের এই সূত্র কেবল রাশিয়ার জন্যে প্রচারিত হয়নি, হয়েছিল পৃথিবীর সব দেশের জন্যে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মনে দাগ রেখে যায়নি কোনোখানেই। একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে গান্ধীজীকে। কিন্তু তিনিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কারুশিল্প নিয়ে যে পরিমাণ ভাবিত ছিলেন সে পরিমাণ জমির ওপর চাষীদের স্বত্ব নিয়ে নয়। তাঁর পরে বিনোবাজী ভূদানের কর্মোদ্যোগ আরম্ভ করে বহুদূর অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে সব জমি গোপালের, কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়। না ভূস্বামীর, না কৃষিজীবীর। এর মানে জমির ওপর চাষীর স্বত্ব নেই। গ্রাম সভাই স্থির করবে কে কোন্ জমি চাষ করবে, কার শ্রমের কী পারিশ্রমিক বা কার সার বীজ ইত্যাদি নিয়োগের দরুন কী উপস্বত্ব। এককথায় বিনোবাজীও জমির বেলা প্রাইভেট প্রপার্টি মানেন না। অথচ রাষ্ট্রকর্তৃত্বও মানেন না।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় মার্কসবাদীদের হাতে ক্ষমতা এসেছে। তাঁরা সব জমি রাষ্ট্রের দখলে এনেছেন। রাষ্ট্রই একচ্ছত্র ও একমাত্র মালিক। চাষী যে জমিতে চাষ করে সে জমি তার নিজস্ব নয়। দয়া করে তাকে তার বাস্তুভিটা ও সংলগ্ন একটুকরো জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সে তরিতরকারি লাগায়। এ ছাড়া সমষ্টিগতভাবে গণখামারে কাজ করতে পারে। কিংবা রাষ্ট্রের খাস খামারে। কাজ অনুসারে মজুরি বা অংশীদারি স্থির করা হয়। "জমিটা আমার, এখানে আমি ইচ্ছামতো ফসল উৎপাদন করব ও ফসল বিক্রি করে ভোগ্যপণ্য কিনব", একথা বলার অধিকার সোভিয়েত রাশিয়ার কৃষিজীবীদের নেই। চীনের খবর আমি আরো কম রাখি। যতদূর বুঝি চীনের মার্কসবাদীরা চাষীদের গ্রামে আটক রাখতেই চান, শহরে টেনে আনতে নারাজ। সুতরাং তাঁদের নীতি চাষীদের মন বুঝে কাজ করা। সোভিয়েত রাশিয়া যেমন শ্রমিকদের রাষ্ট্র গণচীন তেমনি কৃষকদের রাষ্ট্র। তবে ইদানীং সোভিয়েতের নতুন সংবিধানে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের সূত্র পরিত্যক্ত হয়েছে। বোধহয় এই কারণে যে সোভিয়েত এতকাল পরেও খাদ্যে স্বয়ম্বর হতে পারেনি, যদিও তার জমির পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি বই কম নয়। চাষীকে তার প্রাপ্য না দিলে যা হয় তাই হয়েছে! জমিদার ও কুলাকদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে ক্ষুদে চাষীদেরও স্বত অস্বীকার করা হয়েছে। যার স্বত্ব নেই সে কেন ঝড়-বৃষ্টি-বরফ অগ্রাহ্য করে ক্ষেতে নামবে? সেও দশটা-পাঁচটা আপিস করবে বা কারখানায় খাটবে।

সব দেশের ও সব মতবাদের বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি বড়ো বড়ো ইন্ডাস্ট্রি বা ফার্মের ওপরেই। ইউনিটগুলি যতো বড়ো তত ভালো। বড়ো ইউনিট নাকি বেশি ইকনমিক। বৃহত্তমসংখ্যকের মহত্তম কল্যাণ এঁদের কাছে ধর্তব্য নয়। এঁদের চিন্তা ক্যাপিটালিস্ট দেশে ধনিক শ্রেণীর তথা শ্রমিক শ্রেণীর কিসে লাভ হয়। আর কমিউনিস্ট দেশে শ্রমিক শ্রেণীর কিসে লাভ হয়। এককভাবে ধনিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখনো কৃষিজীবীদের; ব্যতিক্রম কেবল ওটি দশেক পাশ্চাত্য দেশ ও জাপান। এসব দেশে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ হয়, তাই চাষীর সংখ্যা কম হলেও চলে। খাদ্যের অভাব হলে এরা গরিব দেশগুলির কাছ থেকে সস্তায় কিনে আনে। বা সেসব দেশ যদি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে এটা নামমাত্র দামে ফাঁকি দিয়েও পাওয়া যায়। টলস্টয় এই দুই বিকল্পের কোনোটাই পছন্দ করতেন না। তাঁর জীবন কেটেছিল চাষীদের সঙ্গে গ্রাম অঞ্চলে। শোষকশ্রেণীর একজন বলে তাঁর অন্তরে যে গ্লানি ছিল সেটা তিনি একমুহূর্তের জন্যেও ভোলেননি। তাই তাঁর বাণী ছিল, চাষীকে তার জমির অধিকার দাও। মেহনৎ যার মালিকানা তার। রাষ্ট্র এখানে মালিক হয়ে বসতে চায় কেন? জমিদারদের চেয়ে রাষ্ট্র এমন কী নিঃস্বার্থ? অধিকাংশ নাগরিকদের স্বার্থই যদি রাষ্ট্রের স্বার্থ হয়ে তবে কৃষকদের ভোটেই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হবে। তা কি কোথাও হয়? যতদিন না তা হয়েছে ততদিন কৃষিজীবীরা বঞ্চিত থাকবেই। খাদ্য উৎপাদনেও ঘাটতি পড়বে। আজ দুনিয়া জুড়ে খাদ্যের ঘাটতি। এর যদি কোনো স্থায়ী প্রতিকার থাকে তবে তা ভূমির সদ্ব্যবহারে। ভূমিই আসল। আর তার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী হচ্ছে সেই যে বারোমাস সেখানে বাস করে ও চাষ করে। সামাজিক ন্যায় হচ্ছে এই মূল সত্যের স্বীকৃতি ও এরই আলোকে নীতি নির্ণয়।

কিন্তু একজন মানুষ তো কেবল কৃষক নয়, সে নাগরিকও। একজন নাগরিক হিসাবে সেও চায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভোটদানের স্বাধীনতা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, যারা তার ওপরে কর ধার্য করে তাদের কাছে জবাবদিহি দাবি করার স্বাধীনতা, যারা তাকে ধরে নিয়ে যুদ্ধে পাঠায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্বাধীনতা। এখন এই নিয়ে যাঁদের মাথাব্যথা তাঁর কি লিবারল বলে সকরুণ অবজ্ঞার পাত্র? নাগরিক হিসাবে কৃষকরাও কি তাঁদের কাছে ঋণী নয়? লিবারলরা সচেষ্ট না হলে আরো বেশি লোকের ফাঁসি হতো, নির্বাসন হতো, ভ্রান্ত বিচারে দণ্ড হতো, কারাবাস হতো। দেশে লিবারলরা সক্রিয় না হলে কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহস পেতো না। স্বাধীন চিন্তার নামগন্ধ থাকত না। স্বয়ং টলস্টয়কেই লিখতে দেওয়া হতো না। রুশ

সাহিত্য কোথায় ছিল আর কোথায় গিয়ে পৌঁছল এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় লিবরলদের শতবর্ষব্যাপী প্রয়াসকে। বিপ্লবের পর লিবারলরাও নেই, তাদের সে প্রয়াসও নেই। রুশ সাহিত্য কি উঠেছে না পড়েছে?

সোশিয়াল ডেমোক্রাট তাঁদের বলা হতো যাঁরা ডেমোক্রাসির সমাজতন্ত্রকে ঢালতে চেয়েছিলেন। পার্লামেন্টারি উপায়ে সামাজিক আধারে অন্যায় দূর করতে পণ করেছিলেন। হয়তো এটা তৎকালীন অবস্থায় অবাস্তব। কিন্তু যেটা অবাস্তব সেটা কি অবজ্ঞেয়? এই আদর্শ মেনে নিয়ে সুইডেন কিছুটা সাফল্য দেখিয়েছে। ইংল্যান্ড কতকটা সফল হয়েছে। আরো অনেক দেশ এদের অনুসরণ করছে বা করতে চায়। এতেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব সবচেয়ে কম। মানুষ মানুষকে খুন করবার জন্যে হাতিয়ার শানায় না। একটা শ্রেণী আর একটা শ্রেণীকে অক্ষরে অক্ষরে নির্বংশ করতে চায় না। পরিবর্তন যা হয় তা বিলম্বিত, কিন্তু বিলম্বিত বলে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কত লোক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচে, কত লোক কারাগারের কবল থেকে রক্ষা পায়, কত লোক নির্বাসনের দুঃখ থেকে রেহাই পায়, কত লোক কেঁচোরমতো ভয়ে ভয়ে বাঁচার দুর্গতি থেকে নিস্তার পায়। সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের অবজ্ঞা না করে অভিনন্দন করা উচিত। ইতিহাস তো এই শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। বাহাত্তর বছর তার কাছে এমন কিছু বেশি সময় নয়।

তারপর বিপ্লববাদীদের কথা। তাঁদের প্রাইভেট প্রপার্টিতে বা পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে বিশ্বাস নেই। কোটি কোটি মানুষের বিনাশ তাঁদের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতো পূর্ব হতে অবধারিত। ওটা ছিল বিধাতার দ্বারা অবধারিত, আর এটা নাকি ইতিহাসের দ্বারা অবধারিত। ধর্মবিশ্বাসের মতো প্রবল ও গভীর এই মতবাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এঁরা এঁদের বিশ্বাসের জোরেও তরবারির জোরে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করেছেন। কাজও দেখিয়েছেন এত বেশি যে অবজ্ঞা না করে অভিনন্দনই করতে হয়। অন্যেরা যদি সময় থাকতে আরো বেশি বা সমান কাজ না দেখাতে পারেন তাহলে ভারতও রুশ-চীনের পন্থা অনুসরণ করতে পারে। তখন আর নালিশ করা চলবে না কয় কোটি মারা গেল বা গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে বেগার খাটল। কেঁচো হলো আরো কয় কোটি। সাহিত্য বা শিল্প কোনখানে থেমে গেল। নষ্ট করাবার মতো সময় অন্যদের হাতে নেই। জনগণ অধীর। (১৯৭৭)

আনা কারেনিনা

'আনা কারেনিনা' প্রকাশের পর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। শতবর্ষের আলোয় ওর নতুন একটা সমীক্ষার প্রয়োজন। শেষ জীবনে টলস্টয় তাঁর নিজের সৃষ্টির ওপর বিরূপ হয়েছিলেন। আর্টের যে সীমানা তিনি বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন তা মহৎ ভিন্ন আর কাউকে স্বীকৃতি দেবে না। 'আনা কারেনিনা'র বিষয়বস্তু তাঁর মতে মহৎ নয়। শুধু তাঁর মতে কেন, অনেকেরই মতে মহৎ কাব্য বলব কেন? তাতে যুদ্ধের বর্ণনা আছে বলে? টলস্টয় তো শেষ জীবনে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'আনা কারেনিনা'র শেষ খণ্ডে তাঁর যুদ্ধবিরোধী জীবনদর্শনের প্রভাব পড়েছে।

টলস্টয় স্বয়ং খাটো করতে চাইলেও আমি তাঁর 'আনা কারেনিনা'কে কখনো খাটো করতে রাজি হইনি। প্রথম বয়স থেকেই আমি 'আনা কারেনিনা'র অনুরাগী। নভেল যদি লিখতেই হয় তো ওরই মতো নভেল। তাতে জীবনের সব দিক আছে। নীতিনিপুণের মতো তার কোনো অংশ বাদ দেওয়া উচিত নয়। শিল্পবস্তু হিসাবেও আমি ওর মূল্যবত্তায় বিশ্বাস করি। গ্রেট নভেল বলতে যা বোঝায় 'আনা কারেনিনা' নিঃসন্দেহে তার পর্যায়ভুক্ত। আর্টের রাজ্যে যা গ্রেট তা হয়তো মরালিটির রাজ্যে গ্রেট নয়। মরালিটির রাজ্যে যা গ্রেট তা হয়তো মরালিটির রাজ্যে গ্রেট নয়। যে চিত্র মরাল টেস্টে উত্তীর্ণ হবে না সে এস্থেটিক টেস্টে হতেও পারে। সেইরকমই হয়ে এসেছে এতকাল। চিত্রের মতো কাব্য বা নাটক বা উপন্যাসও আর্ট। তাকেও এস্থেটিক টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হয়। তা যদি সে হয় তবে মরাল টেস্ট তার পরের কথা। এইটেই ছিল আমার প্রথম বয়সের মতো। পরে আমিও লিখতে লিখতে উপলব্ধি করেছি যে আর্টের সঙ্গে মরালিটির সম্বন্ধ অবান্তর নয়। প্রচ্ছন্নভাবে নৈতিক ভালো-মন্দের নিকর্ষও থাকে। তবে নির্জলা ভালো বা নির্জলা মন্দ বলে কিছুই নেই। সাদা ও কালোর মাঝামাঝি আরো অনেকগুলো রঙ আছে। ঈশ্বর ও শয়তানের বৈপরিত্য মানুষের বেলায়

খাটে না। সত্যিকার মানুষ এত জটিল যে তাকে সরল করে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যেমন জীবনে তেমনি আর্টে। 'আনা কারেনিনা' যে ব্যর্থ হয়নি তার কারণ সত্যিকার সরল মানুষকে টলস্টয় সরল করতে যাননি। তত্ত্ব এখানে সত্যকে লোহার ছাঁচে ঢালাই করেনি।

'আনা কারেনিনা' যখন প্রথম পড়ি তখন আমার বয়স কত? আঠারো উনিশ কুড়ি। বইখানা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বলেই আগ্রহ এত। আদ্যোপান্ত পড়ার মতো ধৈর্য নেই, অর্ধেকের ওপর তো লেভিনের অর্থাৎ টলস্টয়ের জমিদারি দর্পণ ও জীবনজিজ্ঞাসা। ওসব আমি লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যাই। আমার একমাত্র আকর্ষণ নিষিদ্ধ প্রেমে ও প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে বিরহে। পরিণাম যে লিভিন ও কিটির সমাজসম্মত প্রেমের বেলা হবে সুখের এটা তো ভালোই, কিন্তু আনা ও ভ্রনস্কির অসামাজিক প্রেমের বেলা হবে পাপের ও পাপের ফলে পতনের ও পতনের ফলে মৃত্যুর, এতে আমার অন্তরের আপত্তি ছিল। এটা তো হোমারের মতো হলো না, হলো না খ্রিস্টপূর্ব গ্রিক জীবনবোধের বা মূল্যবোধের মতো। পাপ থেকে পতন, পতন থেকে মৃত্যু হেলেনের বেলা ব্যবস্থা নয়। প্রেমিকের সঙ্গে কুলত্যাগিনী হেলেন পারিসের সঙ্গে পতি-পত্নীরূপে আনন্দেই দশ বছর বাস করেছিল। পরে হেলেনই মেনেলাইসের ঘরে সম্মানের সঙ্গে ফিরে আসে ও পতিপত্নীরূপে বাস করে। সমাজবিধানে বা নীতিবোধে বাধে না। খ্রিস্টীয় ক্ষমাধর্মেরও প্রয়োজন হয় না। হেলেন হরণের জন্যে ট্রয় অভিযানেরই প্রয়োজন ছিল। যেহেতু গ্রিকদের সম্মান নষ্ট হয়েছিল। নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধার করতে হলে যুদ্ধ করে হেলেনকে পুনরুদ্ধার করতে হয়। এর মধ্যে পাপ কোথায়, পতনইবা কার? পতন যদি কারো হয়ে থাকে তবে ট্রোজানদের। মৃত্যুও তাদেরই। কিন্তু হেলেনকে তা বলে কেউ বলবে না 'ফলন উওম্যান বা 'পতিতা নারী'। বস্তুত 'পতিতা' কথাটিও ইংরেজি 'ফলন নারী'র অনুবাদ। এখন ওটি গণিকার সমার্থক হয়েছে। গ্রিকরা বা প্রাচীন ভারতীয়রা অমন কথা ভাবতেই পারতেন না। ওটা ইহুদি-খ্রিস্টান ধারণা। টলস্টয় ওটা গ্রিক রোমান ক্লাসিক ঐতিহ্য সূত্রে পাননি, পেয়েছেন ইহুদি খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য সূত্রে। ব্যভিচার সেখানে হত্যার মতো অপরাধ। দশবিধ অনুজ্ঞার অন্যতম 'ব্যভিচার করিয়ো না'। নারীপক্ষে অতি কঠোর শাস্তি। সকলের দ্বারা লোষ্ট্রাঘাতে নিধন। পুরুষের পক্ষে অতটা কঠোর নয়। কারো কারো বেলা আদৌ কঠোর নয়। রাজা ডেভিড তো অপরের ক্ষেত্রে পুত্রলাভ করেন। ইতিহাসে রাজা সলোমনের স্থান কত উচ্চে! সেই উত্থানের পেছনে ছিল পতন, কিন্তু তার জন্যে শাস্তির কথা কেউ কখনো

বলেনি। সাধারণের বেলায়ই শাস্তি। বিশেষ নারীর বেলায়। টলস্টয় এই প্রাচীন ধারণার উত্তরসূরি। খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনের পরও তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল অভিজাত সমাজের পূর্বতন নর-নারী প্রেমনীতি। নাইট ও লেডিদের হৃদয় বিবাহের দ্বারা শাসিত ছিল না। রাজা আর্থারের রানী গুইনেভেয়ার ছিলেন নাইট ল্যান্সলটের প্রেমাসক্ত। সে প্রেম নিতান্ত অশরীরী ছিল না। 'কোর্টলি লাভ' বা রাজসভাসম্মত প্রেম যাকে বলা হতো সেটা ছিল উত্তমের প্রতি অধমের পূজা নিবেদন। অন্তত প্রকাশ্যে কামগন্ধহীন। তার থেকে এসেছে অসংখ্য রোমান্স ও ত্রুবাদুর গীতি। এদেশে যেমন কানু বিনে গীত নেই ইউরোপে তেমনি 'কোর্টলি লাভ' বিনে মধ্যযুগীয় কাব্য ও রোমান্স নেই। সাধুরা পছন্দ করতেন না, কিন্তু জনসাধারণ ভালোবাসত। সাধুরা নিয়ে এলেন এর মধ্যে পাপবোধ। পাপের পরিণাম মৃত্যু। যেখানে মৃত্যু নয় সেখানে সমাজের বাইরে পতিত হয়ে থাকা। সেটা মৃত্যুর চেয়েও অসহনীয়। আত্মঘাতিনী না হলে টলস্টয়ের আনা কারেনিনাকেও অপাঙক্তেয় হয়ে থাকতে হতো। বড়লোকের রক্ষিতার যে পরিমাণ মর্যাদা তার বেশি সে পেত না। প্রণয়ীর দ্বারা পরিত্যক্ত হলে সে যা হতো তাকে বলে ফরাসি ভাষায় 'দেমি মঁদ'। আমরা বলি 'হাফ গেরস্ত'। অপেরা বা থিয়েটারের অভিনেত্রীদের মর্যাদা আগে যেরকম ছিল। দিনকাল বদলেছে। তাঁরাও জাতে উঠেছেন। একশো বছর পরে লেখা হলে 'আনা কারেনিনা'র পরিণাম অবশ্যম্ভাবীরূপে ট্র্যাজিক হতো না। এমনকি সমসাময়িক ফ্রান্সে বা ইংল্যান্ডে লেখা হলেও কাহিনীর শেষটা অতখানি মর্মান্তিক না হতেও পারত। গলসওয়াদি যে ওটা মেনে নিতে পারলেন না তার কারণ তাঁর অভিজ্ঞতা ভিকটোরীয় ভণ্ডামির হলেও পশ্চিম ইউরোপীয় উদারতার। টলস্টয় দুটোর কোনোটার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনেপ্রাণে খ্রিস্টীয় আদর্শে বিশ্বাসী। তার থেকে করুণা। আবার তারই থেকে মরণান্ত সমাধান। মাঝখানে অবশ্য আরো একটা বিকল্প ছিল। আনা অনুতাপ করে স্বামীর সংসারে ফিরে যেত। সেই ভরসায় স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্স ঘটানো হয়নি। কিন্তু তাতে রসভঙ্গ হতো। টলস্টয় নীতিনিপুণ হলেও আর্টিস্ট। আর্টের দিক থেকে স্বামীর সঙ্গে মিলন অসম্ভব। আবার নীতির দিক থেকে প্রেমিকের সঙ্গে বিবাহ অবাঞ্ছনীয়। তা হলে তো নারীর পদস্খলনকে পুরস্কৃত করা হলো। সেই সঙ্গে পুরুষের পদস্খলনকেও।

'সমর ও শান্তি' সারা হয় ১৮৬৯ সালে। পরের বছর টলস্টয়ের পত্নী তাঁর দিদিকে লেখেন এবার তাঁর স্বামী লিখতে চান একটি অভিজাত শ্রেণীর বিবাহিতা মহিলার পদস্খলনের কাহিনী। তাঁর সমস্যা হবে তাঁর কাহিনীর নায়িকাকে

এমনভাবে উপস্থাপিত করা, যাতে তাকে গিলটি মনে না করে প্যাথেটিক মনে করা হয়। দোষী মনে না করে করুণ মনে করা হয়। বই লেখা শুরু হয় ১৮৭৩ সালে। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৭২ সালে ঘটে যায় এক সত্যিকার দুর্ঘটনা। রেল লাইনে কাটা পড়ে মারা যান এক ভদ্রমহিলা, তাঁর নামও আনা। প্রতিবেশী এক বিপত্নীক জমিদারের উপপত্নী। জমিদার তাঁর সন্তানদের গভর্নেসকে বিবাহ করতে চান শুনে আনা আত্মহত্যা করেন। টলস্টয়কে এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সম্ভবত এর থেকেই তিনি পেয়ে যান তাঁর নায়িকার নাম ও পরিণাম। যা শুধুমাত্র করুণ হতে পারত তাই হলো ট্র্যাজিক। ট্র্যাজেডিকে অবশ্যম্ভাবী করতে হলে তার কারণ দর্শাতে হয়। কারণ থেকে কার্য ঘটে এটা যেমন সত্য তেমনি সত্য কার্যও কারণকে চুম্বকের মতো নিয়তির অভিমুখে টানে। আমার অনুমান টলস্টয়ের আনার ভবিতব্যই তার অতীতকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কাহিনীকে সত্যঘটনামূলক করতে গিয়ে মূল কল্পনাকে তদানুযায়ী করতে হয়েছে। ওরকম একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে কার্য হয়তো কারণ থেকে নিম্নমুখে বইত, কার্য থেকে কারণ উজানে বইত না। টলস্টয় আনাকে নিয়ে কী করবেন তা জেনে নিয়ে বই লিখতে আরম্ভ করেন। কিছুদূর এগোতে না গোতেই এক রেল দুর্ঘটনা। একটি লোক চাকার তলায় পড়ে মারা যায়। স্বেচ্ছায় কিংবা নেশার ঘোরে কিংবা কুয়াশায়। ভ্রনস্কির সঙ্গে আনার প্রথম সাক্ষাতের পরক্ষণে ওটা কি শুভদৃষ্টি না অশুভদৃষ্টি?

আনার বিয়ে হয়েছিল যাঁর সঙ্গে তিনি তার থেকে বয়সে বিশ বছরের বড়ো, সুদক্ষ ও প্রবীণ রাজকর্মচারী। দেশের সাবাই তাঁকে একডাকে চেনে। বিদেশেও তাঁর নামডাক। এমন মানুষের সময় কোথায় যে স্ত্রীকে সঙ্গ দেবেন? বিয়ের আগে ভালোবাসা হয়নি, বিয়ের পরেও না। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিতান্তই কর্তব্যের সম্বন্ধ। দু'জনেই দু'জনের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। ভালোবাসা আনার জীবনে যখন এলো তখন সে শুধু একজন বিবাহিতা মহিলা নয়, একটি পুত্রের জননী। তার ছেলের বয়স আট বছর। তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা তার ছেলের ওপরেই কেন্দ্রীভূত। তার ছেলেই তার জীবনের কেন্দ্র। একটা দিনের জন্যেও সে ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। এমন যে পুত্রগত প্রাণ জননী তার জীবনে কোন্ এক অশুভক্ষণে অবিবাহিত ভ্রনস্কির আবির্ভাব। কাউন্ট ভ্রনস্কি ধনীর সন্তান, স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে সৈনিকের জীবন, সেটা তার কেরিয়ার হলেও জীবিকা নয়, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি নিয়েই সে আপনাকে ব্যস্ত রাখে। প্রেমে পড়ার মতো অবসরও নেই, অভিপ্রায়ও নেই। বিবাহ তো দূরের কথা। তাকে স্বামীরূপে

কামনা করেছিল আমার ননদ কিটি, তার প্রেমেও পড়েছিল ওই অষ্টাদশী তরুণী। আনার আরেক ননদ ডলি একদিন তার স্বামী স্টিভার অবিশ্বস্ততার প্রমাণ পেয়ে স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়। তখন তাকে শান্ত করার জন্যে পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো ছুটে আসে আনা। রেলপথে সহযাত্রিণী হন বর্ষীয়সী কাউন্টেস ভ্রনস্কি। মস্কো স্টেশনে তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে বাড়ি আনার জন্যে যায় তাঁর পুত্র। সেই সূত্রে ভ্রনস্কির সঙ্গে আনার প্রথম দর্শনে প্রেম।

এই নিষিদ্ধ প্রেম তাদের দু'জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক অপ্রতিরোধ্য বন্যায়। সে যেন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার ওপরে মানুষের হাত নেই। প্রকৃতিই স্থির করে দেয় তাদের নিয়তি। আমার বিবেক একটুও সায় দেয় না, কিন্তু সারা দেহ সারা মন সারা হৃদয় সারা সত্তা সাড়া দেয়। এই বন্যায় সে তার পায়ের তলার মাটি থেকে ছিটকে পড়ে। সেটার নামই কি পদস্খলন? পতন? ভ্রষ্টতা? ভ্রনস্কিরও একই দশা। কিন্তু তার তো স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, তাদের প্রতি কর্তব্যের টান নেই। সে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীন সেও নয়। নিষিদ্ধ প্রেমে জড়িয়ে পড়ে মিলিটারি ডিউটিতে অবহেলা করলে তারও চাকরি নিয়ে টানাটানি। অবিবাহিত পুরুষের জীবনে বিবাহিতা নারীর সঙ্গে 'অ্যাফেয়ার' নতুন কিছু নয়। অমন তো কত হয়। তেমনি বিবাহিতা নারীর জীবনেও অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে 'অ্যাফেয়ার' অজ্ঞাত বা অশ্রুত নয়। উভয় পক্ষই ওটাকে ক্ষণস্থায়ী বলে জানে, তাই অনিত্যের জন্যে নিত্যকে বিসর্জন দেয় না। ওটা ক্ষণিকের মতিভ্রম। ব্যাপারটাকে ওইভাবে নিলে আনাকেও কুলত্যাগ করতে হতো না, তার স্বামীকেও হতমান হতে হতো না, ভ্রনস্কিরও মিলিটারি সার্ভিস থেকে পদত্যাগ ঘটত না, কিটিরও হতাশ প্রেম থেকে অসুখ বাধত না, ভ্রনস্কির সঙ্গেই শেষপর্যন্ত তার বিয়ে দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করতে পারা যেত। 'আনা কারেনিনা' হতো একখানি কমেডি। তা না হয়ে যা হলো তা একখানি ট্র্যাজেডি। মূল কারণ, আনা ও ভ্রনস্কির প্রেম অভিজাত সমাজে প্রচলিত সাধারণ একটা 'অ্যাফেয়ার' নয়, যাকে দু'দিন বাদে বা দু'বছর বাদে ঝেড়ে ফেলতে পারা যায়। অবৈধ সহবাস সত্ত্বেও। অবৈধ সন্তানলাভ সত্ত্বেও। কারেনিন যথেষ্ট ক্ষমাশীল ছিলেন, আত্মীয়স্বজনও যথেষ্ট দরদি। কিন্তু যে-নারী পর-পুরুষকে ও যে-পুরুষ পরনারীকে বরাবরের জন্যে আপনার করতে চায় তাদের এ পক্ষের যদি একটি সন্তান থাকে ও সে সন্তানের মায়া কাটানো পরম দুঃখকর হয় তবে তার পরম দুঃখের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। সেই দুঃখিনী দয়িতাকে সুখী করা ধন দিয়ে নয়, মান দিয়ে নয়, সঙ্গ নিয়ে নয়, এমনকি ডিভোর্সের পর বিবাহ দিয়েও কারো সাধ্য নয়।

এক্ষেত্রে ধনের কোনো অভাব ছিল না। মানের অভাব ছিল, পিটার্সবুর্গের অভিজাত সমাজে আনা অপমানিত হয়েছিল। মস্কোর অভিজাত মহলেও সে অপঙ্‌ক্তেয়। গ্রামে গিয়ে বসবাস করাই ছিল প্রকৃষ্ট পন্থা। যেদিন ওরা গ্রামে ফিরে যাবে তার আগের দিন ঘটে আনার স্বেচ্ছাবৃত অপঘাত। আনা নিশ্চয়ই আশঙ্কা করেছিল যে গ্রামেও সে সমানভাব মিশতে পারবে না। সেখানেও তার আসন হবে জমিদারের রক্ষিতার। সেখানেও তার মনে সন্দেহ থাকবে যে আনার ডিভোর্স যখন হয়নি তখন ভ্রনস্কি তাকে বিয়ে না করে অন্য একজনকে বিয়ে করতে পারে। অথচ আনার ডিভোর্সের জন্যে ভ্রনস্কির যত মাথাব্যথা আনার ততখানি নয়। আনার পক্ষে ডিভোর্স পাওয়া না পাওয়া ছিল সেকালের আইন অনুসারে তার স্বামীর করুণানির্ভর। যে নারী ব্যভিচার দোষী সে কখনো তার স্বামীকে দোষ দিয়ে ডিভোর্সের জন্যে আদালতে যেতে পারে না। আদালতে যেতে হলে যেতে হবে তার স্বামীকেই। স্বামীই স্ত্রীকে দোষ দিয়ে ডিভোর্স আদায় করতে পারে। কিন্তু সেরূপ স্থলে স্ত্রীর কলঙ্ক হবে, ছেলের কলঙ্ক হবে, স্বামীরও যে কলঙ্ক হবে না তা নয়। কারেনিন সেটা এড়াতে চেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও উকিলের পরামর্শ নেন। পরে দেখা গেল কারেনিন একজন বিশ্বাসী খ্রিস্টান। খ্রিস্ট নিষেধ করে গেছেন স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে। দোষী হলেও তাকে ক্ষমা করতে হবে। চার্চেরও সেই বিধান। কারেনিন প্রথমটা উপরোধে পড়ে নিজের ঘাড়ে দোষটা টেনে নিয়ে আনাকে ডিভোর্স দিতে রাজি হয়েছিলেন। তার মানে তাঁকেই মিথ্যা কথা বলতে হতো যে তিনিই অন্য নারীগামী। আনার খাতিরে তিনি এতদূর যেতে রাজি হলেও ছেলেকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। পরে তাঁর কথা থেকে মনে হলো তিনি তাতেও রাজি, কিন্তু কন্যার জন্মের পর কন্যাকে নিয়ে যখন আনা ভ্রনস্কির সঙ্গে ইতালি চলে যায় তখন কারেনিনের সঙ্গে কথাবার্তার খেই ছিঁড়ে যায়। ইতিমধ্যে কারেনিন পড়েন কাউন্টেস লিডিয়ার প্রভাবে। এই ধার্মিক মহিলা তাঁকে বোঝান যে ডিভোর্স পেলে আনা ঘরে ফিরে আসতে চাইলেও ফিরে আসতে পারবে না, তার ভালো হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আনার মঙ্গলের জন্যেই ওর প্রত্যাবর্তনের পথ খোলা রাখাই শ্রেয়।

কারেনিন নিজে আবার বিয়ে করতেন না। তিনি আদর্শ খ্রিস্টান হতে চেয়েছিলেন। কেউ যদি তোমার একগালে চড় মারে তুমি তার দিকে আরেক গাল বাড়িয়ে দেবে, এই নীতির অনুসরণে তিনি অপরাধিনী স্ত্রীকে তার দ্বিতীয় বিবাহে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু আনা তাঁর কাছে করুণা প্রার্থনা করেনি, তার হয়ে করেছিল তার দাদা। সে অনুতপ্ত হয়নি। প্রেমের জন্যে তার

দেহমনহৃদয় ক্ষুধার্ত। তার ক্ষুধার নিবৃত্তি তার ভরা যৌবনে না হলে সে সারাজীবন জ্বলত। তার জীবন জুড়িয়েছে বলে কি সে অনুতাপ করবে? তবে এটাও জানে যে সে বিবাহের শপথভঙ্গ করে অপরাধী হয়েছে। তার অপরাধবোধ সত্য। অথচ অপরাধের দরুন করণীয় যে অনুশোচনা সেটা অসত্য। ভগবান তাকে যেমন করে গড়েছেন সে তেমনি। সে সত্যকথা বলে, সত্যাচরণ করে, না পারলে বিবেকের দংশনে পীড়া পায়। ছলনা তার স্বভাবে নেই। স্বামীর অঙ্গীকৃত ডিভোর্স প্রত্যাখ্যান করে আনা দ্বিতীয় বিবাহের সুযোগ হারায়। পরে যখন ভ্রনস্কির পীড়াপীড়িতে স্বামীর করুণাপ্রার্থী হয় ততক্ষণে বেশি দেরি হয়ে গেছে। তিনি অঙ্গীকারভঙ্গ করেন।

ভ্রনস্কির মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানকে যে দুঃখ পোহাতে হয় সে দুঃখ অন্য প্রকার। আনার গর্ভে তার যে কন্যা হয়েছে তাকে সে নিজের বলে দাবি করতে পারে না। আইনত সে কারেনিনের। তার পদবি ভ্রনস্কি নয়, কারেনিন। পরে যেসব সন্তান জন্মাবে তারাও কেউ ভ্রনস্কি বলে পরিচিত হবে না, তবে কারেনিন বলে। তাহলে বংশরক্ষা হবে কী করে? সে ধরে নিয়েছে যে আনার সঙ্গে তার আইন অনুসারে বিয়ে হবে, যদি তার আগে ডিভোর্সটা হয়। চার্চ তেমন বিবাহ স্বীকার করবে না, কিন্তু রাষ্ট্রে তার নজির আছে। তখন তো তার সন্তানদের ভ্রনস্কি বলে পরিচিত হতে বাধা থাকবে না। আনার মতিগতি কিন্তু বিপরীত। সে আর মা হতে চায় না। তা বলে সে ব্রহ্মচারিণী নয়। জন্ম শাসনের উপায় জেনে নিয়েছে। এ নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকাতে মনোমালিন্য। ভ্রনস্কি চায় স্বামী-স্ত্রীর সহজ স্বাভাবিক জীবন। তার কি ধনের অভাব যে একটি সন্তানেই সে সন্তুষ্ট হবে? তাও পরের নামাঙ্কিত। সে চায় আরো সন্তান। পুত্রসন্তান। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আনার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কাছে তার স্বামীর দিকের পুত্রই যথেষ্ট। এক মুহূর্তের জন্যেও সে তার পুত্রকে ভুলতে পারে না। তার জীবনকে সে ভাগ করে দিয়েছে পুত্র আর প্রেমিক দু'জনের মধ্যে। সে একই কালে পুত্রগত প্রাণ ও প্রেমিকগত প্রাণ। কী করে তাদের একবৃন্তে মেলাবে এই তার সমস্যা। ডিভোর্স এ সমস্যার সমাধান নয়, যদি না পুত্রকেও তার পিতা তার মার সঙ্গে থাকতে দেন। না, কিছুতেই তিনি এতে রাজি হবেন না। এটা দুরাশা।

আনা ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছিল পুত্রের সঙ্গে প্রেমিকের জোড় মেলাতে না পেরে। সে মেনে নিতে পারছিল না যে তাকে পুত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনধারণ করতে হবে। তার মনে হচ্ছিল তার মরণই ভালো। এ রকম একটা

সমাধান তার মাথায় আসে যখন তার কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে সূতিকারোগে তার প্রাণ সংশয় হয়। ঘটনাটি ঘটে তার স্বামীর গৃহেই। আমাকে বাঁচাতে তিনিও যৎপরোনাস্তি করেন। কন্যাটি যদিও তাঁর নয় তা সত্ত্বেও তিনি তাকে ভালোবাসেন। সেই সন্ধিক্ষণে আনার মৃত্যু হলে আশ্চর্যের বিষয় হতো না, কারণ ডাক্তাররাও সেই আশঙ্কা করেছিলেন। ভ্রনস্কির বেদনা তখন দেখবার মতো। মৃত্যু আসন্ন জেনে আনা নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর সঙ্গে প্রেমিকের শান্তি স্থাপন করে। এমন একটি স্বর্গীয় দৃশ্য বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। গ্রন্থ যদি এইখানেই সমাপ্ত হতো স্বামী, স্ত্রী ও প্রেমিকের মহিমাময় মিলনের মধ্যে কাহিনীর পরিণতি কী মহৎ হতো। তবে সূতিকারোগে মরণ ঘটত আনার।

কিন্তু গ্রন্থকারের অভীষ্ট ছিল সে রকম মৃত্যু নয় অন্যরকম মৃত্যু সংঘটন। তার ইঙ্গিত তিনি দিয়ে রেখেছিলেন ভ্রনস্কির সঙ্গে আনার প্রথম দর্শনের সময়। দুর্ঘটনার বার্তা শুনে আনা মন্তব্য করেছিল, "এটা একটা অশুভ লক্ষণ।" তাদের মিলনের পরেও দেখা দেয় আর একটা অশুভ সঙ্কেত। ঘোড়দৌড়ে জয় হতে যাচ্ছে ভ্রনস্কির। এমন সময় সে লম্ফমান ঘোড়ার পিঠে লম্বমান না হয়ে ধপ করে বসে পড়ে। ঘোড়ার পিঠ ভেঙে যায়। যন্ত্রণার থেকে মুক্তিদানের অন্য উপায় না থাকায় ঘোড়াটিকে গুলি করে মারতে হয়। ওটি অশ্ব নয়, অশ্বিনী। সুন্দরী ও সুগঠিত। যেন আনা কারেনিনার প্রতিরূপ। ভ্রনস্কি তাকে ভালোবেসে মনোনয়ন করেছিল। অথচ তারই অপঘাত মৃত্যুর নিমিত্ত হলো।

শেষের দিকে আনা মৃত্যুর জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল। ডিভোর্স পেলেও কি সে বাঁচতে চাইত? দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও কি সে বাঁচত? তার জীবন কি সার্থক হতো পুত্রকে বরাবরের মতো হারিয়ে প্রত্যাবর্তনের পথ বরাবরের মতো রুদ্ধ করে? এ বই তিন রকম ভাবে লিখতে পারা যেত। এ ব্যাপার পঞ্চাশ বছর আগে ঘটলে কারেনিন পুশকিনের মতো ডুয়েল লড়ে মারা যেতেন। ভ্রনস্কিও তো আনার মৃত্যু আসন্ন দেখে আত্মঘাতী হতে যাচ্ছিল। গুলিটা বুকে লাগলে সে-ই মারা যেত। ত্রিভুজকে দ্বিভুজে পরিণত করতে হলে একজন না একজনকে মরতে হতোই। সেই একজন হলো টলস্টয়ের বিচারে আনা। লেখকের বিচারই চূড়ান্ত। আনা যোগ দিল বিশ্বসাহিত্যের ট্র্যাজিক হিরোইনদের সঙ্গে। হেলেন তাদের একজন নয়। তার সঙ্গে তুলনা বৃথা। ট্র্যাজিক হিরোইন হওয়া কি সম্ভব হতো আনা যদি পতিহারা বা সাথীহারা হয়ে বেঁচে থাকত? পতিহারা হলে পুনর্বিবাহ সুগম হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় স্বামীর সামঞ্জস্য হতো কী করে? সাথীহারা হলে পুত্রসুখে সুখী হতো, কিন্তু প্রিয়সঙ্গ পেত কোথায়?

মরণ ঝাঁপ দেবার আগে আনার স্বগতচিন্তার বিক্ষিপ্ত টুকরোর মধ্যে এটাও ছিল যে তার প্রেমিক তাকে প্রেম দিয়ে তৃপ্ত করতে পারেনি। কামনার তৃপ্তির জন্যে সে পিপাসার্ত। তার শঙ্কাও ছিল যে ভ্রনস্কি তাকে একদিন সঙ্গ না দিয়ে পরিত্যাগ করবে। পতিপরিত্যাগিনী হবে প্রেমিকপরিত্যক্তা। ভ্রনস্কি আগের মতো সমাজে মেশে, আনা তো তা পারে না। এটাও তার সহ্য হয় না। তা বলে কি পুরুষ মানুষ তার সব কাজ ফেলে প্রিয়ার সঙ্গে সমস্তক্ষণ কাটাবে? একটি দিনের জন্যেও বাইরে যাবে না? গেলে তার প্রিয়া তাকে ভুল বুঝবে? বস্তুত বিবাহ একজন পুরুষকে বা নারীকে যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেয় বিবাহ-ব্যতিরিক্ত একত্রবাস সে পরিমাণ স্বাধীনতা দেয় না। বিবাহেই নিরাপত্তা বেশি। সোয়াস্তি বেশি। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো। কারেনিনের সঙ্গে আনার সুখ ছিল না, সোয়াস্তি ছিল। আর ছিল সামাজিক মর্যাদা ও মেলামেশার পরিসর। ভ্রনস্কির সঙ্গে সুখ ছিল, সোয়াস্তি ছিল না। আর ছিল না সামাজিক স্বীকৃতি ও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ। কোলের মেয়েটিকে নিয়ে কী জানি কেন তার আনন্দ ছিল না। ভ্রনস্কিরও না। সে-ই হতে পারত তাদের মিলনের সেতু। কিন্তু আনা তাকে ভালোবাসত না, ভ্রনস্কিও যে আদর করত তা তো মনে হয় না। কারেনিনেরই তার প্রতি একটা অহেতুক মমতা।

টলস্টয় তাঁর পরিকল্পিত নায়িকাকে 'গিল্‌টি' বলে বিশেষিত করতে চাননি। করতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র 'প্যাথেটিক'। কিন্তু তাঁর পূর্ব কল্পনা ঘটনাচক্রে পরিবর্তিত হয়। তাই আনা কারেনিনা শুধুমাত্র প্যাথেটিক নয়। মূলত গিল্‌টি। সে নিজেও মানে ওকথা। এক শতাব্দী পরে জন্মালে মানত না। গিল্‌ট সম্বন্ধে নর-নারীর বদ্ধমূল ধারণা ছিন্নমূল হয়েছে। প্রেমহীন বিবাহে দেহদান একালের দৃষ্টিতে ক্রীতদাসের নীতি। স্বাধীন মানুষের নীতি নয়। বিবাহহীন প্রেম তার চেয়ে নীতিসম্মত। একালের বিদগ্ধ পাঠক আনাকে গিল্‌টি বলে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হবেন। যতদিন সে তার স্বামীর ঘরে ছিল ততদিন তার দ্বৈতজীবন নীতিবিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু গৃহত্যাগের পর সে কেবল প্রেমিকের সঙ্গেই থাকে। নীতির নিকষে আমি তো এতে অপরাধের বা গিল্‌টের দাগ দেখতে পাইনে। সমাজের নিকষও ঠিক আগের মতো নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর একালের আনারা অনায়াসেই কারেনিনদের ফেলে ভ্রনস্কিদের সঙ্গে বাস করছে। ডিভোর্স হয়তো হয়নি, পুনর্বিবাহ হয়তো ঘটেনি, সন্তান হলে বার্থ রেজিস্টারে ভ্রনস্কিদের নাম লেখা হচ্ছে। আইন এখন এতদূর উদার হয়েছে যে ডিভোর্সের মামলায় কোনো পক্ষের অপরাধ প্রমাণ করতে হয় না। কে অপরাধী কে নয় তাতে কিছু আসে

যায় না। একালের পাঠক বুঝতেই পারবে না আনা কারেনিনা কী এমন অপরাধ করেছিল, কেন তার অমন নিষ্ঠুর পরিণাম হলো।

টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি'র একটা শাশ্বত আবেদন আছে। এক শতাব্দী পরেও তার ইতরবিশেষ হয়নি। 'আনা কারেনিনা' সম্বন্ধেও সেকথা বলা চলে কি? তারও কি একটা শাশ্বত আবেদন আছে? এক শতাব্দী পরেও কি ও বই তেমনি সজীব, তেমনি সুন্দর, তেমনি সার্থক, তেমনি প্যাসন ও তেমনি কম্প্যাশন ভরা? টলস্টয় যেসব প্রতিমায় জীবন্যাস করেছিলেন তারা কি তেমনি রক্তমাংসের মানুষ, তেমনি ভালোয়-মন্দে মেশা? এটি একটি আশ্চর্য চরিত্রচিত্রশালা। যে যেমন সে তেমন। প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। শিল্পকর্ম হিসাবে 'আনা কারেনিনা' এখনো অতুলনীয়। যে টলস্টয় আর্টিস্ট তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এতে। আর্টের দিক থেকে স্বয়ং ডস্টয়েভস্কির মতে এ নভেল নিখুঁত। বিতর্ক কেবল মনস্তত্ত্ব নিয়ে। মনস্তত্ত্ব ইতিমধ্যে আরো বেশি সূক্ষ্ম হয়েছে। ফ্রয়েড এসে চিরকালের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছেন। অবচেতনে অবগাহন করলে চিন্তার ও আচরণের অন্যরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তার পর সেকালের সেই সাদা-কালো দোরঙা নীতি ও নর-নারীর দোরোখা নীতি একালে মেনে নেওয়া যায় না। মরালিস্ট টলস্টয়ের সঙ্গে একালের বিদগ্ধ জনের মতভেদ অন্যায্য নয়। আনা যদি বাঁচত তাহলে ভ্রনস্কির প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেমই তাকে সাধারণ পতিব্রতার চেয়ে মহত্তর আসন দিত। যেমন দিয়েছে রাধাকে। পরিত্যক্তা বলে রাধাকে তো মরতে হয়নি। তবে রাধা তো শ্যামের জন্যে কুলত্যাগ করেননি। যার জন্যে কুলত্যাগ সে-ই যদি পরিত্যাগ করে তবে তার শাস্তি প্রাণত্যাগ। তার মর্ম নিজের মৃত্যু। ভ্রনস্কিকে আনা ভুল বুঝে গুরুদণ্ড দিয়ে গেল। ধ্বংস করে গেল তার জীবন। যাকে ভালোবাসে তার সর্বনাশ করাই কি প্রেমিকার সাজে? এটাই হয়তো বাস্তব সত্য। যেমন তীব্র প্যাসন তেমনি তীব্র সন্দেহ ও ঈর্ষা। দুঃখীরা দুঃখ দিতে ভালোবাসে। আনার মতো দুঃখিনী কে? ওটাও তো প্রেমের পরীক্ষা। ভ্রনস্কির প্রেম যদি সর্বংসহ হতো তবে হয়তোবা তাদের জীবন স্থায়ী হতো।

এদের দু'জনের প্রেমকে আমরা সামাজিক তথা নৈতিক দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তাই মনে করি এদের ট্র্যাজেডির মূলে সামাজিক তথা নৈতিক বিধি লঙ্ঘন এ ধারণা ভুল নয়, কিন্তু পুরোপুরি ঠিকও নয়। মূলের নিচেও মূল আছে। তলিয়ে না দেখলে নজরে পড়ে না। এই রহস্যের তল মনস্তত্ত্বের অতলে। আনা ভ্রনস্কিকে ভালোবাসে, বহুভাগ্যে পরস্পরকে কাছে পেয়েছে। কিন্তু ওই যে কাছে

পাওয়া ওটাই ওদের কাল হলো। কাছে এলেই ঠোকাঠুকি বাধে। কেন বাধে তার নানা বিচিত্র কারণ। কিন্তু আধুনিক মনোবিদরা ক্রমেই উপলব্ধি করছেন যে, অনুরাগের উল্টো পিঠে বিরাগও থাকে। যাতে সবচেয়ে আনন্দ তাতে সবচেয়ে বেদনা বা বিকার। তা ছাড়া ওটা একপ্রকার রণ। রণ থাকলে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নও থাকে। আনা চায় ভ্রনস্কির ওপর বিজয়িনী হতে। ভ্রনস্কি কি বার বার পরাজয় মেনে নেবে? কখনো কি বিদ্রোহী হবে না? আনা চায় বিজিতকে বন্দি করে রাখতে। বন্দি কি মুক্তির জন্যে ছটফট করবে না? আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় একটা কথা। সেক্স ওয়ার। ওর তর্জমা করলে কটূ লাগবে। উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ নেই। আনা কারেনিনার স্রষ্টা শুধু যে মনোবিদ্ ছিলেন তাই নয়, বহু নারীর সংসর্গে এসে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছিলেন। তাঁর নারীচরিত্রগুলি সেইজন্যে এমন জীবন্ত। তিনি যেন তাদেরই একজন হয়ে ভিতর থেকে তাদের দেখেছিলেন ও বুঝেছিলেন।

নারীজাতি সম্বন্ধে বিষম তিক্ত ছিলেন টলস্টয়। গোর্কিকে যা বলেছিলেন তার মর্ম নারী সম্বন্ধে সত্য কথা বলা বিপজ্জনক। যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে সেদিন তিনি একটি পা কবরের মধ্যে রেখে নারী সম্বন্ধে সত্য কথাটি নির্ভয়ে বলবেন। তাড়াতাড়ি আর একটি পা কবরের ভিতর টেনে নিয়ে ধপ করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বেন। সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন। দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই তিনি সংজ্ঞা হারান। মনের কথাটা মনেই থেকে যায়।

'আনা কারেনিনা' বিশ্লেষণধর্মী রচনা। তখনকার দিনের পক্ষে ব্যতিক্রম। তা হলেও নর-নারী সম্পর্কের ওপর নির্ভয়ে আলোকপাতের অনুকূল ছিল না সে যুগ। না বলা কথাটা আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। টলস্টয় মেনটালের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এলিমেন্টাল স্তরে পৌঁছেছিলেন। যেকথা বলি বলি করে বলতে সাহস হলো না সেকথা বোধহয় এলিমেন্টাল।

উপন্যাসটির চাবি নিহিত রয়েছে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত সেই উক্তিটিতে যেটি মুদ্রিত হয়েছে 'আনা কারেনিনা' নামটির নিচে। তার মর্ম "প্রতিশোধ আমারই। আমিই অন্যায়ের শোধ নেব"। অর্থাৎ দণ্ডদানের কর্তা ভগবান স্বয়ং। দণ্ড দিতে হয় তিনিই দেবেন। দেবেন যথাকালে যথানিয়মে। মানুষ মানুষকে দণ্ড দিতে পারে না। কারেনিন আনাকেও না। আনা ভ্রনস্কিকেও না। বাইবেলে আছে—

"Dearly beloved, avenge not yourselves; but rather give place unto wrath; for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith

the Lord. Therefore if thine enemy hunger, feed him : if he thirst, give him drink : for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good." (New Testament, Ronans, Chapter 12, verses 19-21)

এই বই লেখার সময় টলস্টয়ের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাংসারিক সাফল্যে তাঁর বৈরাগ্য এসেছিল। তিনি খুঁজছিলেন জীবনের অর্থ। যা না পেলে জীবন বৃথা। একটু একটু করে তিনি ঝুঁকছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের দিকে। কিন্তু গির্জার দিকে নয়। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল। ধীরে ধীরে তিনি এই প্রত্যয়ে পৌছান যে, হিংসার উত্তর প্রতিহিংসা নয়, অহিংসা। আঘাতের উত্তর প্রত্যাঘাত নয়, ক্ষমা। অনিষ্টের উত্তর পাল্টা অনিষ্ট নয়, উপকার। শত্রুতার উত্তর বর্জন নয়, শত্রুকে তার ক্ষুধার অন্ন তৃষার জল জোগানো। মন্দের উত্তর প্রতিরোধ নয়, অপ্রতিরোধ।

এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র লেভিন। সে যেন বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়সের টলস্টয়। জীবিকার চেয়ে জীবনকে নিয়েই সে ভাবিত। তার জীবন পরিশেষে অর্থবান হয়, তার অন্তর হয় নতুন অনুভূতির দ্বারা আপ্লুত। তাকে ভালো হতে হবে, ভালো কাজ করতে হবে, তার জীবনকে ভালো দিয়ে ভরে দিতে হবে। লেভিনের মতো টলস্টয়ের জীবনও ভালোর দিকে মোড় নয়। সেই বয়সে নয়, আরো পরিণত বয়সে। 'আনা কারেনিনা' লিখতে গিয়ে তিনি লেভিনের কলমে নিজের ধর্মীয় অনুভূতির কথাও লিপিবদ্ধ করেন। আনা ও ভ্রনস্কির কাহিনী ফুরিয়ে যাবার পরেও লেভিনের কাহিনীর রেশ থাকে। আর্ট নয়, মর‍্যালিটি নয়, মনস্তত্ত্ব নয়, ধর্মীয় উপলব্ধির ওপরেই যবনিকা পড়ে। লেভিনের তথা টলস্টয়ের অন্তঃপরিবর্তন এ গ্রন্থের উপসংহার। এখন থেকে তিনি ঋষি টলস্টয়।

(১৯৭৯)

রেজারেকশন

বছর পঞ্চাশ বয়সে টলস্টয়ের জীবনদর্শন এমন গভীরভাবে বদলে যায় যে সেই পরিবর্তন যেন একপ্রকার ধর্ম পরিবর্তন বা কনভারসন। ভিতরে ভিতরে তিনি ফিরে যান যিশুখ্রিস্টের আদি শিষ্যদের যুগে। যাঁদের জীবনযাত্রা ছিল সরল, নিরলঙ্কার, সকলের প্রতি সপ্রেম, হিংসা প্রতিহিংসাবর্জিত, ক্ষমাপরায়ণ, শাসনমুক্ত, শোষণমুক্ত, আত্মশ্রমনির্ভর, নারীসম্পর্কহীন বা পরনারী সম্পর্কহীন, বেশ্যাবৃত্তিবিরোধী। আদি খ্রিস্টানদের ছোট ছোট কমিউন পরবর্তীকালে অতিকায় চার্চে পরিণত হয়, চার্চের উচ্চাভিলাষ রাষ্ট্রের উচ্চাভিলাষেকেও ছাড়িয়ে যায়, খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানদের আগুনে পুড়িয়ে মারে, ক্রীতদাস বানিয়ে কেনাবেচা করে, বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়, সৈনিকবৃত্তির সমর্থন করে, যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়, শ্রমিকদের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে তাদের বঞ্চিত করে, কৃষকদের জমি কেড়ে নেয়। টলস্টয় যেমন রাষ্ট্রের ওপরে তেমনি চার্চের ওপরে সমান বীতশ্রদ্ধ হন, অথচ ভলতেয়ারের মতো উভয়কে ধ্বংস করার প্রবর্তনা দেন না। যে প্রবর্তনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব। যে বিপ্লবের জের চলছিল রুশ দেশের শিক্ষিত মানসে। টলস্টয়ের বাণী হলো, ফিরে চল মাটির টানে, ফিরে চল যিশুর আদর্শে, ফিরে চল নীতির জগতে।

'আনা কারেনিনা' লিখতে লিখতেই তিনি এই প্রত্যয়ে উপনীত হন যে যিশুর প্রদর্শিত পথই শ্রেষ্ঠ পথ, যদি তাকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা হয়। তিনি প্রথমে নিজের জীবনে, পরে পরিবারের জীবনে ও আরো পরে দেশের তথা মানবজাতির জীবনে প্রেম, ক্ষমা, অপ্রতিরোধ, অপ্রতিশোধ, কায়িক শ্রম প্রভৃতি মূলনীতিগুলি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন। তাঁর লেখার কাজ হয়ে ওঠে তাঁর জীবনসাধনার অঙ্গ। আর্টের জন্যে আর্ট নয়, আদর্শের জন্যে আর্ট, নীতির জন্যে আর্ট, মানবহিতের জন্যে আর্ট। আর্টের জন্যে আর্ট যারা বলে তারা অর্থকরী পণ্যের পসারী, পণ্য তাদের বিলাসী ও বিলাসিনীদের উপভোগের জন্যে, এরা ধনিক শ্রেণীর লোক, এদের পঙ্কিল জীবনই তাতে প্রতিফলিত হয়, জনগণের

আর্ট অন্য জিনিস। সেই অন্য জিনিসের চর্চা করতে করতে টলস্টয় তাঁর ছোটগল্পগুলিকে যিশুর উপদেশাত্মক উপকথার মতো সরল, সহজ, সর্বপ্রকার বাহুল্য ও কৌশল মুক্ত করেন। উপন্যাস নামক প্রকরণটার ওপরেই তাঁর অনীহা জন্মায়। দুটি-একটি উপন্যাসিকা লিখেই তিনি পাঠকদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চান। কিন্তু পাঠকরা তাতে তৃপ্ত হবে কেন? কী একটা কারণে টলস্টয়পত্নী একবার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সম্রাট স্বয়ং নালিশ করেন, 'টলস্টয় আর উপন্যাস লেখেন না কেন?" কাউন্টেস এর কী কৈফিয়ৎ দেবেন? অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ঔপন্যাসিক স্বেচ্ছায় সে পথ থেকে সরে গিয়ে চাষী মজুরের জন্যে ধর্মীয় উপকথা লিখছেন। সেসব উপকথা চিরন্তন হতে পারে, কিন্তু সমসাময়িক সমস্যার প্রতিফলন কোথায়? আধুনিক জীবনটাই যদি জটিল হয়ে থাকে তবে সেই জটিলতাও কি আর্টের বিষয় নয়? বিষয় যদি দাবি করে উপন্যাসের আকার ও আধার তাহলে উপন্যাসই লিখতে হয়। লিখলে তা প্রকাশ করতেও হবে। প্রকাশ করলে তার থেকে অর্থও আসতে পারে। তা বলে কি সেটা অর্থকরী পণ্য! কেবল বড়লোকেরাই কিনবে। লিখবে যারা সকলেই বড়লোক হবে?

এসব প্রশ্ন এড়ানোর জন্যে টলস্টয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁর গ্রন্থের ওপর কপিরাইট থাকবে না। যার ইচ্ছা সে বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করতে পারে। পাঠকদের ঘরে ঘরে পৌঁছয় এটাই তাঁর কাম্য, অর্থ তিনি চান না। কিন্তু সংসার চলবে কী করে, যদি বই থেকে টাকা না আসে? যদি জমিদারিও চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়? যদি অন্য কোন আয়ের পন্থা না থাকে? পরিবারটিও তো ক্ষুদ্র নয়। টলস্টয় পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাস করতেন না। ব্রহ্মচর্যের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কপিরাইট না থাকলে প্রকাশকরাই লাভের সমস্তটা পান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ভেসে যায়। শেষে একটা রফা হয় গৃহিণীর সঙ্গে। জীবনের মোড় পরিবর্তনের আগেকার লেখার ওপর কপিরাইট থাকবে টলস্টয় পরিবারের। পরবর্তী রচনার ওপর কপিরাইট কারো নয়। সেগুলি সৃজনধর্মী-প্রচারধর্মী। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক এই হলো লেখকের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় যখন গান্ধীর মতো মানুষের হাতে টলস্টয়ের প্রচারধর্মী রচনাগুলি পড়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি 'টলস্টয় ফার্মে' বাস করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা বদলে যায়।

'আনা কারেনিনা' লিখে টলস্টয় মনে করেছিলেন আর উপন্যাস লিখতে হবে না। কিন্তু অমন একজন জাতশিল্পী কি তাঁর প্রতিভাকে বন্ধ্যা করতে পারেন? বিশ বছর বাদে উপন্যাসের জগতে ফিরে যেতেই হলো। উদ্দেশ্যটা বিশুদ্ধ আর্ট

সৃষ্টি নয়। তার আবরণে নীতিনির্দেশ। 'রেজারেকশনে'র টলস্টয় স্বদেশের ও সব দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতিনির্দেশক বা মরাল লিডার। তাঁর এই উপন্যাসের নায়িকা সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ নয়, ছোটলোকের ঘরের পিতৃপরিচয়হীন বারবধূ। যিশুখ্রিস্টের শিষ্যা মেরি ম্যাগডালেনের মতো আর কোনো গণিকার পতনের পর পুনরুত্থান আমার জানা নেই। টলস্টয়ের সৃষ্ট কাতুশা মাসলোভার পতনের পর পুররুত্থান আমার মনে হয় মেরি ম্যাগডালেনের পদাঙ্ক অনুসরণ। তার পতনের মূলে ছিল তার দোষ নয়, আরেকজনের। সেই এই উপন্যাসের নায়ক নেখলুডভ। নায়িকাকে কলঙ্কিত অবস্থায় পরিত্যাগ করে সে তার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। দশ বছর বাদে যখন তাকে পুনরাবিষ্কার করে তখন সে বাধ্য হয়ে বেশ্যা। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে দস্যুতা ও নরহত্যার অভিযোগ। আদালতে জুরির বিচার চলছিল। নেখলুডভের ডাক পড়েছিল একজন জুরর হিসাবে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই 'বিচারক'।

কাতুশার এই দুর্গতির জন্যে দায়ী কে? নেখলুডভের বিবেক জাগ্রত হয়। সে দায়ী করে নিজেকেই। মামলার বিবরণ শুনে তার বিশ্বাস হয় না যে কাতুশা টাকার জন্যে মানুষ খুন করেছে। কিন্তু জুরির বিচার তো। জুরির রায়, সে দস্যুতার অপরাধে অপরাধী নয়, কিন্তু খুনের অপরাধে অপরাধী। এতে নেখলুডভের অমত ছিল। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে সে সকলের সঙ্গে একমত হয় ও পরে সচেতন হয়ে শিউরে ওঠে যে কাতুশা বিনা অপরাধেই চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত। এই ঘোর অবিচারের বিরুদ্ধে সে কাতুশার হয়ে আপিল করে। আপিল নিষ্ফল হয়। তখন মহামান্য সম্রাটের কাছে আবেদন করে। শেষে কারাদণ্ড মকুফ হয়, কিন্তু নির্বাসন বহাল থাকে।

নেখলুডভ পণ করেছিল সে কাতুশাকে রাজদ্বার থেকে উদ্ধার করবেই, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। মেয়েটি যাতে আবার বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন না করে, যাতে সমাজে সম্মানের স্থান পায় সেইজন্যে তাকে বিবাহ করবে। এটা তার নিজের প্রায়শ্চিত্ত। কাতুশাকে পাঁকে নামিয়েছে যে, সে-ই তাকে পাঁক থেকে টেনে নির্মল করবে। তাহলে তো তাকেই নির্মল হতে হয় তার আগে। তার নিজের জীবনকেও উন্নত করতে হয়। সে কি আর পাঁচজন জমিদারের মতো কৃষকের রক্ত শোষণ করে না? সে কি তাদেরই মতো বিলাসব্যসনে নিমগ্ন নয়? সে কি তাদেরই মতো একজন পরকীয়ার সঙ্গে প্রেম করে না? একই কালে একটি কুমারীকে বিয়ে করে স্বকীয়া রূপে পেতে চায় না? নেখলুডভ হাত ধুয়ে নিজেকে সাফ করে। প্রেম করা ছেড়ে দেয়। বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। জমিদারি চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে না দিলেও খুব কম খাজনায় বিলি করে। ঘরবাড়ি ছেড়ে

সাইবেরিয়ায় গিয়ে কাতুশার সহচর হবার জন্যে প্রস্তুত হয়। কাতুশা যতদিন চাইবে ততদিন সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করবে। কায়িক সম্ভোগ বর্জন করবে।

কিন্তু একরাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতায় একটি নিরীহ নিষ্পাপ মেয়েকে পাপের পথে ঠেলে দেওয়া যেমন সহজ তাকে সেই পথের মাঝখান থেকে ফিরিয়ে আনা তেমন সহজ নয়। বেশ্যালয়ে শত শত— শত শত কেন, সহস্রাধিক—পুরুষ তাকে পাপের সাথী করেছে, তার শরীর নিয়ে কেনাবেচা করেছে। সে কি আর মানুষ! সে কি আর নারী! সে এখন নারকী। নেখলুডভ যদি কামের প্রস্তাব করত তাহলে সে অনায়াসে বুঝত। তা তো নয়, এ প্রস্তাব প্রেমের প্রস্তাব, বিবাহের প্রস্তাব। এ প্রেম স্বর্গীয়, এ বিবাহ সামাজিক। এর মধ্যে কামগন্ধ নেই। নেখলুডভ এখন অন্য মানুষ। মানুষ হয়ে সে মানুষকে শোষণ করে না, শাস্তি দেয় না, যুদ্ধবিগ্রহ ও দণ্ডদান থেকে তার বিশ্বাস উঠে গেছে। সে সকলের মঙ্গল করতে চায়। নিজে ভালো হবে, পরের ভালো করবে। কাতুশা যদি তাকে প্রত্যাখান করে তাহলেও সে ওকে পরিত্যাগ করবে না। ওর সঙ্গে সাইবেরিয়া যাবে ও সেখানে চার বছর থেকে ওর সেবা করবে। সেইভাবে প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবেই। সে একদম নাছোড়বান্দা। এটা তার নিজের বিবেকের তাড়না থেকে উদ্‌গত কর্তব্য।

কাতুশা তাকে ভুল বোঝে। এসব কথা মনে থাকা উচিত ছিল দশ বছর আগে। তাহলে তো জীবন অন্যরকম হতো দু'জনের। সে যা বলে তার মর্ম, সেদিন যাকে তুমি কায়িক সুখের জন্যে ব্যবহার করেছিল আজ তাকে ব্যবহার করতে চাও আত্মার কল্যাণের জন্যে। ঈশ্বরের রোষ থেকে রক্ষা পেতে। তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি আত্মহত্যা করব। আমার জীবনটাকেই নষ্ট করে দিলে তুমি। তোমার জন্যে আমার গর্ভে সন্তান এলো। সেও মারা গেল। আবার তুমি এসেছ কী করতে? আমাকে কারামুক্ত করতে? উত্তম। পারো তো করো। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি থেকে উদ্ধার করবে কী করে? ও ছাড়া আর কী গতি আছে আমার? বিবাহ? তা কি কখনো হয়? তুমি কত বড়ো আর আমি কত ছোট! তুমি একজন প্রিন্স। তুমি বিয়ে করবে একজন প্রিন্সেসকে। আমাকে বিয়ে করে তুমি কোনো দিন সুখী হবে না। একটানা ত্যাগস্বীকার করে তুমি অসুখী হবে। আমি তোমার অমন আত্মত্যাগ গ্রহণ করতে নারাজ।

আসলে নেখলুডভের অন্তরে যে প্রেম ছিল সে প্রেম করুণাঘন খ্রিস্টীয় প্রেম। তাকে প্লেটোনিক প্রেম বলা চলে না। রোমান্টিক প্রেম তো নয়ই! কাতুশা কামগন্ধ আর চায় না, চায় সেই ভালোবাসা যা কাতুশাকে কাতুশা বলে

ভালোবাসা। দুঃখিনী বলে দয়া করা নয়, পতিত বলে উদ্ধার করা নয়, ছোটলোক বলে অনুগ্রহ করা নয়।

কারাগারে ও সাইবেরিয়ার পথে কাতুশার সঙ্গে নেখলুডভের অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। একপক্ষের ক্ষমাহীন মনোভাব অপরপক্ষের একনিষ্ঠতার ফলে একটু একটু করে বদলায়। অভিজাত শ্রেণীর লোক হওয়ার মস্ত বড়ো সুবিধা এই যে তার সামনে সব দরজা খুলে যায়। যেটা খোলে না সেটা টাকার ফুস্ মন্তরে খোলে। চারদিকে ঘুষের রাজত্ব। বিশেষ করে সাইবেরিয়ায়। একদিন কাতুশা কারাগার থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু নির্বাসন থেকে নয়। তাকে সাইবেরিয়াতেই চার বছর কাটাতে হবে। তখন তারই ওপর স্থির করে, সে চায় একজন বিপ্লবী বন্দির সাথী হতে। তার নাম সাইমনসন। সে সত্যবাদী, অহিংসক, জিতেন্দ্রিয়। তার সঙ্গে সম্পর্কটা কামগন্ধহীন। সেও বিবাহের প্রস্তাব করেছে। বিপ্লবাদিনী মারিয়া পাভলোভ্না কিন্তু কটাক্ষ করে যে বিবাহটা কামগন্ধহীন থাকবে না। যা হয়ে থাকে তাই হবে।

কাতুশা যখন সাইমনসনকেই বরণ করেছে তখন নেখলুডভের আর করণীয় কী আছে? সেও মুক্তি পায়। ততদিনে সেও হৃদয়ঙ্গম করেছে যে তারও ঘর চাই, ঘরণী চাই, সন্তান চাই, নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক চাই। সমাজ শ্রেণীশূন্য হোক আর নাই হোক, পুরুষ নারীশূন্য হতে পারে না, পরিবার সন্তানশূন্য হতে পারে না। কাতুশা তাকে স্বাধীনতা দিয়েছে, সে স্বাধীনভাবে মনোনয়ন করবে। কাকে, কবে, এসব কথা পরে। আপাতত সে কাতুশার প্রতি কর্তব্যের দায় থেকে মুক্ত। তার অতীতের প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত। সে এখন নতুন মানুষ। এখন থেকে তার নতুন কর্তব্য যিশু যাকে ভগবানের রাজ্য ও ভগবানের ন্যায়ধর্ম বলেছেন তারই অন্বেষণ। সর্বপ্রকার অন্যায়ের প্রতিকার। খ্রিস্টীয় চার্চকে উপেক্ষা করে সে সরাসরি খ্রিস্টের কাছে যায়। তাঁর বাণী মান্য করে।

শ্রেণীচ্যুত হওয়াও তার লক্ষ্য। তবে হিংসাচালিত বিপ্লবীদের সবাইকে সে মন্দ মনে করে না। ভালো, মন্দ, মাঝারি তাদের মধ্যেও আছে। যারা একটি সামান্য প্রাণীকেও আঘাত করতে চায় না তারাও তাদের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে অকাতরে নরহত্যা করতে পিছপাও নয়। মারিয়া পাভলোভ্না তো অভিজাতকন্যা। সে থাকে গরিবদের সঙ্গে গরিবদের মতো, তাদেরই মতো খেটে খায়। পুলিশ হানা দিলে পুলিশকে গুলি করে একজন কমরেড। মারিয়া তার খুনের দায় নিজের ঘাড়ে টেনে নেয়। বলে, আমিই গুলি করেছি। যদিও সে রিভলভার ধরতে জানে না। সাইবেরিয়া যাত্রী বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে কাতুশার নৈতিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। কিছুটা হলেও এতটা নেখলুডভের সাহচর্যে হতো

না। চরিত্রের দিক থেকে বিপ্লবীরা অনেক উন্নত। ওদের সঙ্গে মিশে নেখলুডভের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। সেটা ভালোর দিকে। কিসের জন্য এরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, দুঃখ বরণ করেছে, বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত? আত্মসুখের জন্যে? ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে? না। তাদের সামনে এক মহান লক্ষ্য।

'রেজারেকশন' ছিল যিশুখ্রিস্টের কবর থেকে পুনরুত্থান। খ্রিস্ট ধর্মের এটি একটি মূলতত্ত্ব। টলস্টয় এটিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, এটি একটি বেশ্যালয়ে কবরস্থ নারীর পুনরুত্থান। সাইবেরিয়ায় তার সাজা হয়নি, হয়েছে শাপে বর। কমরেডকে বিয়ে করে সেও কমরেড হবে। বিপ্লবের দিন তাকে দেখা যাবে বারাঙ্গনা বেশে নয়, বীরাঙ্গনা বেশে। প্রিন্সকে বিয়ে করে তার এমন কী সৌভাগ্য হতো। অভিজাত সমাজ কি তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিত? ঘৃণা করত না? তার স্বামীকেও একঘরে করত না? তার সন্তানকেও অপাঙক্তেয় করত না? রাশিয়ার উচ্চতর শ্রেণীর যে চিত্র এঁকেছেন টলস্টয় তা যেন বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির উপরে অবস্থিত দুর্নীতিজর্জরিত পম্পিয়াই নগরী। বিপ্লব যে কত সন্নিকট তা কি টলস্টয় স্বয়ং জানতেন? এ বই সমাপ্ত হয় ১৮৯৯ সালে। সম্রাটের পতন হয় ১৯১৭ সালে। বিপ্লবীরা বেশ্যাবৃত্তি উচ্ছেদ করে। সেটা কি 'রেজারেকশনে'র প্রভাবে? তাই যদি হয়ে থাকে তবে টলস্টয়ের নৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলতে হবে। তিনি তো আর্টের জন্যে আর্ট সৃষ্টি করেননি। তাঁর ছিল সমাজকল্যাণের লক্ষ্য। বেশ্যাবৃত্তির মতো হাজার হাজার বছরের ইভিল কি আর কোনো উপায়ে দূর হতে পারত? বিপ্লব ভিন্ন?

'রেজারেকশন' এই অর্থে মেরি ম্যাগডালেনেরও পুনরুত্থান। কাতুশা মাসলোভা তারই প্রতিরূপ। মেয়েটির সর্বনাশ হয়েছিল ঠিকই, তবু তার মধ্যে কয়েকটি সদ্‌গুণ ছিল। সে কিছুতেই মিথ্যা কথা বলবে না। আত্মরক্ষার জন্যেও না। যে সত্যে স্থির সেও তো সতী। কায়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থে। সে পরদুঃখকাতর। পরের জন্যে সাহায্যে চায়, নিজের জন্যে নয়। সাজা পেলেও সে বিচলিত নয়। সাজাও একদিক থেকে ভালো। সাজা না পেলে সে কি বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে আসতে পারত? সৎপ্রকৃতির মানষের সাক্ষাৎ পেত? বেশ্যালয়ে পচে মরত না? সাইবেরিয়াও তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়। আর যাই হোক সে নরক নয়। দূর থেকে ভয়ঙ্কর দেখায়। কাছে গেলে ভয় ভেঙে যায়।

দ্বিতীয়ত, 'রেজারেকশন' হচ্ছে নেখলুডেভেরও পুনরুত্থান। নীতিহীন জীবনে সে সুখের অন্বেষণ করছিল। তার মতো আরো অনেকে। তারা তারই মতো সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোক। তাদের কেউবা জমিদার, কেউবা বণিক, কেউবা

সাইবেরিয়ায় একঘরে হয়ে কাটাতে হতো। ও যে শ্রমিক বা কৃষাণের জীবনের শরিক হতো তা তো মনে হয় না। জমিদারি থেকেই মাসোহারা পাঠানো হতো। কাতুশা ওকে বিয়ে করতে রাজি হলেও সমাজে মেলামেশা সুগম হতো না। অসিধারব্রতও ভঙ্গ হতো।

এটা টলস্টয়েরও ব্যক্তিগত সমস্যা! এই জমিদারঘটিত ব্যাপারটা স্ত্রীর নামে লিখে দিলেও উপস্বত্ব তিনি নিজেও ভোগ করতেন। জীবনযাত্রার স্টাইলের বিশেষ হেরফের হয়নি। এর জন্যে তাঁর মনে স্বস্তি ছিল। অপরাধবোধ ছিল। নেখলুডভ এদিক থেকে আর একটি লেভিন। অর্থাৎ টলস্টয়।

তাছাড়া আমার মনে হয় যে-কাঁটা নেখলুডভের বিবেকে বিঁধে রয়েছিল সে কাঁটা টলস্টয়ের নিজের বিবেকও। সেটা সম্পত্তিঘটিত নয়। কুমারীর কৌমার্যঘটিত। ক্ষমা! ক্ষমা! ক্ষমার জন্যে তাঁর অন্তরাত্মা আকুল। এ বই লিখে তিনি শাপমুক্ত হলেন। তার মানে এ নয় যে কাহিনীর সমস্তটা সত্য। গোড়ার দিকটা সত্য হওয়াই সম্ভবপর। ঋষি বাল্মীকিও তো যৌবনে দস্যু রত্নাকর ছিলেন।

আর্ট সম্বন্ধে টলস্টয় যেসব নতুন সূত্র নির্দেশ করেছিলেন সেসব তিনি ছোটগল্পের বেলাও পালন করেছিলেন। বড়গল্পের বেলাও বহু পরিমাণে। কিন্তু 'রেজারেকশন' লিখতে গিয়ে তিনি নিজেই নিজের নির্দেশ থেকে সরে যান। ফিরে যান সাবেক সূত্রে। 'সমর ও শান্তি' আর 'আনা কারেনিনা'র সঙ্গে 'রেজারেকশন'র কলাবিধি সংক্রান্ত তেমন কোনো পার্থক্য নেই। থাকলেও প্রকট নয়। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় অপরাধের বিচার কী ভাবে হতো, শাস্তি কী প্রকার হতো, কারাবাস ও নির্বাসন কেমনতর হতো, এসব যদি বিশদ করতে হয় তবে উপন্যাস বৃহদায়তন হবেই। আর উপন্যাস যদি বিশ্বকোষ হয় আর্টের সূত্র পুরোপুরি মেনে চলা সম্ভব নয়। কী নতুন কী পুরনো। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি বাক্য ঠিক ঠিক লিখতে গেলে উপন্যাস লেখা চলে না।

'আনা কারেনিনা' প্রেমের উপন্যাস। যদিও সে প্রেম নিষ্কাম নয়। প্যাশনপূর্ণ। 'রেজারেকশন' প্রেমের উপন্যাস নয়। এর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে অবলার ওপর প্রবলের কাম থেকে, সমাধান হয়েছে প্রবলের প্রায়শ্চিত্তে ও অবলার পূর্ণ মর্যাদালাভে। অবলাই নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে। টলস্টয় সকলের ওপরে স্থান দিয়েছেন ক্ষমাগুণকে। বলবানই ক্ষমা করতে পারে। দুর্বল পারে না। কাতুশা অবশেষে আশ্বাস দেয় যে সব শোধবোদ হয়ে গেছে। তখন নেখলুডভ তার বন্দনা করে। 'কী যে ভালো মেয়ে তুমি!'

বিবেকের তাড়নায় বিবাহ কি কাতুশাকে কৃতার্থ করত। না। সেভাবে একটা ঘোর অন্যায়ের প্রতিকার হতো, কিন্তু অন্যায় আর প্রতিকার নিয়েই কি নর-নারীর আনন্দ? অমন এক নিরানন্দ ঘরসংসার নিয়ে কাতুশাইবা কী করত আর নেখলুডভইবা কী করত।

টলস্টয়ের 'রেজারেকশন' হচ্ছে অর্ধ-খ্রিস্টীয় আর অর্ধ-বৈপ্লবিক । তার এক জায়গায় কার্ল মার্কস লিখিত সুসমাচারেরও উল্লেখ আছে। তবে বিপ্লবীদের বেশির ভাগই মার্কসবাদী নয়, নারদনিক বা পপুলিস্ট। তাদের অভিষ্ট প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ নয়, পিপলস্ ডেমোক্রাসি। কাতুশাকে উন্নত করতে নেখলুডভ একক তপস্যায় অক্ষম হতো। তার সমস্যার সমাধান খ্রিস্টেরও অসাধ্য হতো, যদি না মারিয়া পাভলোভনা, সাইমনসন প্রমুখ বিপ্লবীরা এসে অসাধ্যসাধন করত। তাদের যে নীতি তাতে কাতুশা পতিতা নয়, পাপীয়সী নয়, শোষিতা। সাইমনসন তাকে সাদরে গ্রহণ করে। নেখলুডভরা নয়, সাইমনসনরাই নারী ও শূদ্রের ভরসা। তা হলেও টলস্টয়ের এই টেস্টামেন্ট মথি-লিখিত সুসমাচারেই শেষ।

ইচ্ছা করলে ও চেষ্টা করলে বেশ্যাও শুচি হতে পারে, সাধ্বী হতে পারে, পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথ নিতে পারে, পরকালে স্বর্গে যেতে পারে, কিন্তু ইহকালে কোনো মহাপুরুষ তাকে সমাজে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। খ্রিস্টও যে পেরেছিলেন তারও কোনো নজির নেই। মেরি ম্যাগডালেনও সমাজে স্থান ফিরে পাননি। সব দেশেই সব যুগেই বেশ্যারা সমাজের বাইরে। নারী-জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যারা সমাজের ভিতরে ও যারা সমাজের বাইরে। পুরুষ বাইরে গেলে ভিতরে ফিরে আসে, কিন্তু নারী যদি একবার বাইরে গেল তো বাইরেই থেকে গেল। 'রেজারেকশনে'র সমস্যাটা তো হলো এইখানে। বিশ্বের প্রাচীনতম সমস্যা এই প্রাচীনতম পেশাকে ঘিরে। টলস্টয়ও কি এর মুখোমুখি হলেন? না পাশ কাটিয়ে গেলেন? আনাকে নিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল সে সমস্যা মেটেনি, আনা সমাজ ফিরে পায়নি। কাতুশাকে নিয়ে যে সমস্যা সেটাও কি মিটল? সেও কি সমাজ ফিরে পেল?

(১৯৭৯)

টলস্টয়ের উপকথা

টলস্টয়ের যে-বইখানি প্রথমে আমর হাতে আসে সেখানির নাম 'টোয়েন্টি-থ্রি টেলস'। স্কুল থেকে পাই প্রাইজ হিসাবে। শেষের উপকথাটির বাংলায় তর্জমা করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। নাম 'তিনটি প্রশ্ন'। সঙ্গে সঙ্গে চারু বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তর আসে। লেখা মনজুর। ছাপা হবে। মাস দুয়েকের মধ্যে সত্যি সত্যি প্রকাশিত হলো। তা দেখে আমার সে কী আনন্দ! সালটা ১৯১০। বয়স ষোল। তখনো স্কুলের চৌকাঠ পেরোইনি। এটা একটা অলৌকিক ঘটনা নয় তো কী! লেখাটা আমার নয়, টলস্টয়ের। নইলে ছাপা হতো না। তাঁরই দৌলতে আমার ছাপার অক্ষরে নাম ওঠে। সেই আমার প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা। যদিও অনুবাদের কাজ।

সাহিত্যে আমার শিক্ষানবিসি সেইদিন থেকে শুরু। যাঁর কাছে শিক্ষানবিসি তিনি সব দেশের ও সব কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টলস্টয়। এক্ষেত্রে আমি জাতীয়দতাবাদী নই। বিশ্বনাগরিক। আমার নিয়তি আমাকে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করে। কিন্তু সে-সময় আমি সচেতন ছিলুম না যে আমিও একজন সাহিত্যিক হব ও আমার হাত দিয়েও গল্প-উপন্যাস হবে। আমার নিজের ধারণা ছিল না, চেতনাই ছিল না যে, পরবর্তী বয়সে আমার সম্বন্ধে বলা হবে, "তোমার 'সত্যাসত্য' হচ্ছে তোমার 'সমর ও শান্তি' আর তোমার 'রত্ন ও শ্রীমতী' তোমার 'আনা কারেনিন'।" শুনে তো আমি অবাক। কখনো তো ভেবে দেখিনি যে টলস্টয়ের অনুসরণে আমিও লিখব দু'খানা বৃহৎ উপন্যাস। লেখা হয়ে যাবার পরেই কথাটা ওঠে। আমি বহুদিন থেকে তৃতীয় একখানা বৃহৎ উপন্যাস নিয়ে চিন্তান্বিত, সেটা যদি এ জীবনে লিখে উঠতে পারি তাহলে আবার হয়তো কথা উঠবে যে, "এই বইখানা তোমার 'রেজারেকশন'।" আমার এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইংরেজিতে যাকে বলে রিনিউয়াল। পুনর্নবীকরণ। টলস্টয়ের ধ্যানের রেজারেকশন আর আমার ধ্যানের রিনিউয়াল অবশ্য একই জিনিস নয়। তবু

পুনরুত্থান ও পুনর্নবীকরণ দুটোই পুনঃ। আমার অজ্ঞাতসারে আমি টলস্টয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। একথা আগে কখনো মনে হয়নি। বলাবাহুল্য তিনি ও আমি দুই স্বতন্ত্র ঐতিহ্যে মানুষ। আমি রবীন্দ্রনাথের আরো কাছাকাছি। আমার একটা কাব্যসাধনার দিকও আছে। অবহেলিত যদিও। টলস্টয় ছিলেন কাব্যরসবর্জিত।

টলস্টয়ের সেই তেইশটি গল্পের সব ক'টি সে বয়সে আমি পড়িনি। পরে যখন কলেজ জীবনে টলস্টয়কে আবিষ্কার করি, যাঁর সৃষ্টি 'আনা কারেনিনা'। আমার শিক্ষাগুরু তাহলে কোন্ টলস্টয়? যিনি আর্টের ওপরে নীতিকে স্থান দেন, না যিনি নীতির আগে আর্টকে আসন দেন? যিনি এত সরল-সহজ করে লেখেন যে একটি বারো বছরের ছেলেও বুঝতে পারে, যদি তর্জমাও মূলের অনুরূপ হয়। না যিনি পাঠকের বোধশক্তির ওপর দৃষ্টি না রেখে বিষয়ের অন্তঃসারের ওপরে ও প্রকাশের অন্তঃসৌন্দর্যের ওপরে দৃষ্টি রাখেন? দুই টলস্টয়ের একজনকে যদি বেছে নিতে হয় তবে 'আমি আনা কারেনিনা'র রচয়িতাকেই মনোনয়ন করব। তেইশটি উপকথার বই তুলে রাখি। পড়া শেষ হয় না। কোথায় হারিয়ে যায়।

বইখানা হারিয়ে গেলেও মনের মধ্যে একটা খটকা থেকে যায়। টলস্টয়ের মতো বাক্‌সিদ্ধ সাহিত্যিক সরল-সহজ করে চাষীমজুর ও অল্পবয়সীদের জন্যে লিখতে গেলেন কেন? ইচ্ছা করে যাবতীয় অলঙ্কার ত্যাগ করলেন কেন? বাহুল্য বর্জন করলেন কেন? খুঁটিনাটি পরিহার করলেন কেন? তবে কি তিনি আর আর্টিস্ট নন? লোকহিতের জন্যে আর্টকেও বিসর্জন দিয়েছেন? না এটাই আর্টের চরম সিদ্ধি? আর্ট যখন সর্বপ্রকার ছলাকলার উর্ধ্বে ওঠে তখনি তার আবেদন সর্বব্যাপী হয়। সকলের কাছে তার মর্মবাণী পৌঁছয়। ক'জন চাষী মজুর 'আনা কারেনিনা' পড়ে তৃপ্তি পায়? ক'জন বালকবালিকার হাতে সে বই দেওয়া যায়? দিলেও তারা রস পায়? অপর পক্ষে টলস্টয়ের তেইশটি উপকথা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে, বিভিন্ন ভাষায় তাদের তর্জমা হয়েছে। ষোল বছর বয়সী আমিই একজন তর্জমাকার। আরো কম বয়সীরাও সমঝদার।

বড় হয়ে আমিও একজন লেখক হয়ে উঠি। কিন্তু টলস্টয়ের আদর্শে নয়। কতকটা রবীন্দ্রনাথের, কতকটা প্রমথ চৌধুরীর, কতকটা রঁম্যা রঁলার, কতকটা পশ্চিম ইউরোপীয় সাহিত্যরথীদের। রঁম্যা রঁলারও লক্ষ্য ছিল পিপল পর্যন্ত পৌঁছনো। তাঁর দৌড় এলিট পর্যন্ত নয়। টলস্টয়ের কাছে তিনিও দীক্ষা নিয়েছিলেন। পরে মত পরিবর্তন করেন। শেষে দেখা গেল তিনি যে পরিমাণে সমাজবিপ্লবী সেই পরিমাণে সাহিত্যশিল্পী নন। তাঁর রচনা বক্তব্য প্রধান। আর

সে বক্তব্য ইতিমধ্যে বাসি হয়ে গেছে। অথচ টলস্টয়ের উপকথাগুলি একশো বছর আগে যেমন তাজা ছিল এখনো তেমনি। সমাজের যে কোনো স্তরে, মানুষের যে কোনো বয়সে, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে এদের আবেদন সমান। এ কি কখনো সম্ভব হতো যদি না থাকত প্রচ্ছন্ন এক প্রকার আর্ট? যে আর্ট কলাকৌশলের ধার ধারে না। অথচ রসোত্তীর্ণ।

'সত্যাসত্য' শেষ করে আমি আবার টলস্টয়ের এইসব উপকথার দিকে ফিরি। আমারও সাধ যায় এমনি কয়েকটি উপকথা লিখতে, যেসব উপকথা জনগণের কাছে আদর পাবে। শুধুমাত্র বিদগ্ধ পাঠকের কাছে নয়। আমি আবার নিজেকে প্রশ্ন করি, 'তুমি কি শুধুমাত্র এলিটকুলের লেখক হবে, না জনগণের লেখক হবে?' উত্তর পাই, 'না, শুধুমাত্র এলটকুলের নয়। আমার লক্ষ্য জনগণ। তবে ওদের জন্যে আমি আমার লেখার মান বা আর্টের স্ট্যান্ডার্ড খাটো করতে পারব না। সব রকম চাতুরি, সব রকম ছলাকলা ছাড়তে রাজি আছি, কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে শিবের বিরোধ বাধলে আমি শিবের চেয়ে সৌন্দর্যকেই পছন্দ করব। জনগণ যদি তাতে সন্তুষ্ট না হয় তবে আমি একলা চলব। যারা আমার সঙ্গে চলবে তাদের যদি এলিট বলো তো আমি নাচার।'

এ উত্তর টলস্টয়ের মনঃপূত হতো না। সৌন্দর্যের সঙ্গে শিবের বিরোধ বাধলে তিনি শিবের পক্ষে। মানুষ কী করে ভালো হবে, কী করে মানুষের ভালো করবে, সারা জীবনটা কী করে ভালোর সাধনায় কাটবে পরলোকে নয় ইহলোকেই কেমন করে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, যার সবটাই ভালো, সমস্তটাই শ্রেয়— এই হলো তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা তথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা। যত না তিনি আর্টিস্ট তার বেশি মরালিস্ট। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাস লেখবার সময়ও তাঁর শ্রেয়োবোধ বা নীতিবোধ একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু 'আনা কারেনিনা' লেখার পরে এটা জাজ্বল্যমান হয়। তিনি কথায় ও কাজে ঋষি হয়ে ওঠেন। অধিকাংশ উপকথাই 'আনা কারেনিনা'র পরে লেখা। তবে কয়েকটির আরম্ভ 'আনা'র পূর্বেকার। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই নৈতিক শ্রেয়োবোধ প্রবল। বিশেষত খ্রিস্টীয় করুণা ও ক্ষমা। ব্যতিক্রম 'ভালুকশিকার'। সেটি একটি শিকার কাহিনী। যখনকার ঘটনা তখন তিনি মৃগয়ায় আমোদে যেতেন। পরে তিনি অনুতপ্ত হন, মাছ-মাংস পরিত্যাগ করেন। শেষ বয়সের টলস্টয় অহিংসবাদী। কিন্তু তাঁর শিকারকাহিনী শিবের না হোক সত্যের অনুরোধে লেখা। রচনাশৈলীর দিক থেকে এটি অন্যান্য উপকথার মতোই। একটি কথাও পল্লবিত বা অতিরিক্ত নয়। তীরের মতো একলক্ষ্যে ধাবিত। কলাকৌশল বাদ দিয়ে এ রকম একটি কাহিনী

বলা যেন মশলা বাদ দিয়ে তরকারি রাঁধা। এটি তো তবু আমিষ আর সব নিরামিষ।

ইংরেজিতে যেমন 'টেল' আর 'স্টোরি' বাংলায় তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সেই জন্যেই আমি 'টেল'কে বলতে চাই উপকথা। আর 'স্টোরি'কে গল্প। 'টেল' এর মধ্যে পড়ে 'ফেয়ারি টেল'। তার মানে রূপকথা। আর 'ফোকটেল'। তার মানে লোককথা। টলস্টয়ের এই তেইশটি উপকথার মধ্যে গুটি দুয়েক বিদেশী গল্পও আছে। ফরাসি কথাসাহিত্যিক স্যাঁ পিয়ের ও মোপাসাঁর। টলস্টয় এ দুটিকে নিজের মতো করে লিখেছেন। সাতটি হলো রুশদেশের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত উপকথা। টলস্টয় এগুলির স্রষ্টা নন। তিনি এগুলিকে নিজের করে নিয়েছেন। একটি হচ্ছে রূপকথা। এটা তাঁর বানানো। এছাড়া আছে ছেলেদের জন্যে লেখা গুটি দুই উপকথা ও বড়োদের জন্যে লেখা গুটি দশেক গল্প। বাকি রইল যেটি সেটি সেই শিকারকাহিনী। সত্যঘটনার বিবরণকে কি উপকথা বা গল্প বলা চলে? না বলি তো কী বলব?

কোন্‌টাকে বলব গল্প আর কোন্‌টাকে উপকথার এর বিচার করবে কে? একজনের মতে যেটা উপকথা আরেকজনের মতে সেটা গল্প। একজনের মতে যেটা গল্প আরেকজনের মতে সেটা উপকথা। যাই হোক, এই সংগ্রহের অধিকাংশই হচ্ছে উপকথা। যা মুখে মুখে বলা যায়। যা মৌখিক আকারে প্রচলিত। কালি-কলমের অপেক্ষা রাখে না। লোকমুখে প্রচারিত হলে লোকশ্রুতি। যা শোনা যায়। টলস্টয় আপনাকে এর মধ্যে প্রক্ষেপ করেননি। তবে তাঁর প্রবণতাটা কোন্‌দিকে তা অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি রসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পরিবেশনও করতে চান। শিক্ষা এখানে নীতিশিক্ষা বা ধর্মের যেটা অংশ তারই শিক্ষা। তিনি যেন কথকতার ভার নিয়েছেন। তিনি যেন একজন গুরুমশায়। আমার উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে এতেই আমাকে বিরূপ করেছিল। আমি কি একজন রসজ্ঞ পাঠক নই? আমি কি একটি শিশু বা গ্রাম্য শ্রোতা? শিক্ষকদের কাছে পড়তে পড়তে আমি বিমুখ হয়ে উঠেছিলুম।

পরবর্তীকালে আমিও এসব উপকথা সমঝদার হই। অনেক সময় ভেবেছি আমিও এ রকম কিছু দিয়ে যাব, যা সাধারণ লোক স্মরণ রাখবে, যেমন স্মরণ রেখেছে হাজারো লোকগাথা, লোককথা, প্রবাদ, ছড়া, গীতিকা। 'আর্ট কী' বলে টলস্টয়ের যে বিখ্যাত গ্রন্থ আছে তার থেকে একটি অংশ তুলে দিলে কথাটা আরো স্পষ্ট হবে। এর বাংলা অনুবাদ মোটামুটি এই রকম– 'ভাবীকালের শিল্পীরা বুঝতে পারবে যে, জনাকতক ধনিক শ্রেণীর লোকের সাময়িক বিনোদনের জন্যে

ক্ষণজীবী উপন্যাস বা সিমফনি বা চিত্র রচনার চেয়ে অতুল গুরুত্বপূর্ণ ও ফলবান হচ্ছে একটি রূপকথা বা একটি প্রাণস্পর্শী গীতিকা বা একটি ঘুমপাড়ানী ছড়া বা একটি সরস ধাঁধা বা একটি রঙ্গকৌতুক বা একটি নক্‌শা রচনা, যা চৌদ্দ পুরুষ ধরে লক্ষ লক্ষ শিশুকে ও সাবালককে আনন্দ জোগাবে। মানুষের সরলতম্য অনুভূতিময় এই যে শিল্পের খনি এতে সকল মানুষের প্রবেশ আছে। অথচ এর প্রায় সবটাই এখনো অনাবাদী পড়ে রয়েছে।'

ওই আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলেই তিনি এই জাতীয় রচনায় হাত দেন। তিনি যে মহান উপন্যাস লিখতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু তাঁর মতে মহান উপন্যাসের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ও বলবান হচ্ছে রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি মানুষের সরলতম অনুভূতির চিরায়ত প্রকাশ, যা লক্ষ লক্ষ শিশু ও সাবালকের আনন্দ বিধান করবে। কিন্তু, কই, তিনিও তো এ জাতীয় রচনা শত শত দিয়ে যেতে পারলেন না? যে ক'টি দিলেন তার থেকে পরের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস বাদ দিলে নিজের তৈরি জিনিস গুটি পনেরো। অবশ্য এই সংগ্রহের বাইরেও কিছু আছে। যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন 'ইভান ইলিচের মৃত্যু,' যেমন 'প্রভু ও ভৃত্য'। সেগুলি কিন্তু আকারে বড়ো, প্রকারে জটিল। শিশুরা তার সমঝদার হতে পারে না। সাবালকরা যদি অশিক্ষিত হয়ে থাকে তবে তারাও না। তা বলে কি সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ বা কম বলবান? আমি তো মনে করি টলস্টয় তাঁর শিল্পসাধনার উচ্চতম সোপানে পৌঁছেছেন ওই দুটি গল্প লিখে। কে ধনী, কে নির্ধন এ গণনা অবান্তর। সাময়িক বিনোদন কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারাজীবনের রসাস্বাদনও হতে পারে। স্মরণীয়তাও একপুরুষে ফুরিয়ে যায় না, উপকথা না হয়ে যদি উপন্যাস হয়। আর আর্টের বিচার ভোট দিয়ে হয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষ যাত্রা পছন্দ করে বলে যাত্রাই নাট্যকলার শেষকথা নয়। তার বেলা কালিদাসের শকুন্তলা বা শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট বা ম্যাকবেথ বা ওথেলো মহাকালের মনোনীত। সর্বজনগ্রাহ্য সরল অনুভূতি নিয়ে কালোত্তীর্ণ রচনার নিদর্শন গ্রিক নাট্যকারগণ রেখে গেছেন। কিন্তু তার সংখ্যাও শত শত নয়। সর্বসাধারণের চিরস্মরণীয় শিল্পসৃষ্টি কোন্ দেশে কোন্ কালে ক'টিবা হয়েছে? যে ক'টি হয়েছে সে ক'টি যদি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তো সর্বজনগ্রাহ্য নয় বিদগ্ধজনগ্রাহ্য। ব্যতিক্রম হচ্ছে হোমারের ইলিয়াড, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত। সেইরকম কয়েকটি কাব্য, নাটক উপন্যাস তো আর্টের জগতে নতুন একটি বিভাগ।

টলস্টয় যা বলতে চান তার মানে বৃহৎমাত্রেই মহৎ নয়, ক্ষুদ্রও মহৎ হতে পারে, বৃহৎ হলেই স্থায়ী হয় না, ক্ষুদ্রও স্থায়ী হতে পারে, সাধারণের আনন্দ বরং

ক্ষুদ্রতেই বেশি। আমি এ যুক্তি মানি। তা বলে বৃহতের গুরুত্ব কি অস্বীকার করতে পারি? সরলতম অনুভূতিই কি একমাত্র অনুভূতি? মানুষের জীবনে যতরকম অনুভূতি আছে সবরকম অনুভূতিই কাব্যের বা নাটকের বা উপন্যাসের বিষয়। জটিলতম ও কুটিলতমও অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। আধুনিক মানুষ আর্টের সীমানাকে সম্প্রসারিত করতে চায়। কেবল জনগণের দিকে নয়, বহু নিষিদ্ধ বা গোপনীয় অভিজ্ঞতার দিকেও। এতদিন যা প্রকাশ করতে বাধা ছিল তাও অবাধে প্রকাশ করা হচ্ছে। অথচ টলস্টয় মনে মনে একটা সীমানা বেঁধে দিয়েছেন। রসের থেকে আদিরস একেবারে বাদ গেছে। তাঁর একটিও উপকথা আদিরসাত্মক নয়। নর-নারীর প্রেম একেবারে অনুপস্থিত। বোধ হয় এই কারণে যে শিশুরা তার সমঝদার হবে না। যেন শিশুরা যার সমঝদার নয় তার মূল্য যৎসামান্য।

এদেশে তো কানু বিনে গীত নেই। জনগণও সেই রসেরই রসিক। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি বেঁচে আছেন তাই নিয়ে। তাঁদের পদাবলী যে অমর হয়েছে তা নরনারীর প্রেমের মাধুর্যে। প্রেমিক-প্রেমিকার একজনের কাছে অপরজন হচ্ছে দেবতা। আবার দেবতাই হচ্ছে প্রিয়জন। 'দেবতাকে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' কিন্তু টলস্টয় বোধ হয় এটা অনুমোদন করতেন না। নইলে তাঁর উপকথা সংগ্রহের মধ্যে একটিও প্রেমের উপকথা ঠাঁই পায়নি কেন? রুশদেশের জনগণের কি রসবোধ নেই। তাদের জীবনে কি মধুর রস নেই? প্রচলিত উপকথাগুলির ভিতরে ঈশ্বরপ্রেম আছে, মানবপ্রেম আছে, নেই শুধু মানব-মানবী প্রেম। ভাবীকালের শিল্পীরা কি প্রেম বলতে রাধাকৃষ্ণ প্রেম বুঝবে না? তেমন প্রেমের পদাবলী লিখবে না? টলস্টয়ের শিল্পতত্ত্ব মেনে না নেবার এটাও ছিল আমার একটা কারণ। শিশুরা পড়বে না, বেশ তো বড়ো হোক আগে, তারপর পড়বে। জনগণ পড়বে না, বেশ তো, লেখাপড়া শিখে প্রস্তুত হোক আগে। তার পরে পড়বে। ওরা প্রস্তুত নয় বলে আমি লিখতে পারব না এটা একপ্রকার মানা। সব দুয়ার মানুষের জন্যে খুলে দিতে হবে, এখানে আমি টলস্টয়ের সঙ্গে ষোল আনা একমত। কিন্তু লেখকরাও মানুষ। তাদের কাছে খোলা রাখতে হবে সব দুয়ার। ক্ষুদ্র কবিতা তথা বৃহৎ উপন্যাস। সরলতম অনুভূতি তথা জটিলতম অনুভূতি। ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম, নর-নারীপ্রেম। যার জীবনের যেটা সত্য সেটাই তাকে লিখতে দিতে হবে। নেওয়া না নেওয়া পাঠকের রুচি।

এই উপকথাগুলির মধ্যে টলস্টয়ের নিজের সবচেয়ে প্রিয় ছিল 'ভগবান সত্যকে দেখেন, কিন্তু অপেক্ষা করেন' আর 'ককেশাসের বন্দি'। প্রথমটি তাঁর

মতে ধর্মীয় আর্ট, দ্বিতীয়টি বিশ্বজনীন আর্ট। প্রথম উপকথার নায়ক আকসিওনভ নামে এক যুবক বণিক নিঝনির মেলায় মালপত্র বেচবার জন্যে বাড়ি থেকে রওনা হয়। পথে রাত কাটায় এক সরাইখানায়। সেখানে তার পাশের ঘরে শুয়েছিল তারই পরিচিত আরেকজন বণিক। পরের দিন ভোরবেলা সরাই থেকে বিদায় নেবার পর আকসিওনভ ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। তার মালপত্রের সঙ্গে তার ব্যাগে একখানা রক্তমাখা ছুরি পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে পাশের ঘরের বণিককে খুন করে বিশ হাজার টাকা চুরি করেছে। আকসিওনভ বলে সে এর কিছুই জানে না, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাকে বেত মারা হয়, খনিতে খাটানো হয়, সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়। সেখানে ছাব্বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পর সে অকালে বুড়িয়ে যায়। তার ধার্মিক স্বভাবের জন্যে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। এমন সময় এক নতুন কয়েদিকে সেই কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। আকসিওনভের শহরেই মাকার সেমেনিচের বাড়ি। কথাবার্তা থেকে আকাসওনভ টের পায় যে এই সেই আসল খুনি। ক্রোধে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়, কিন্তু ভগবানের কাছে সারা রাত প্রার্থনা করে। রাতের পর রাত এইভাবে কাটে। একদিন আবিষ্কার করে মাকার কারাগার থেকে পালাবার জন্যে গর্ত খুঁড়ছে। পরে যখন তদন্ত হয় তখন আকসিওনভ মাকারের নাম করে তাকে ধরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে তাকে বাঁচিয়ে দেয়। মাকারের পাষাণ হৃদয় গলে যায়।

'Makar Semenich did not rise, but best his head on the floor. 'Ivan Dmitrich, forgive me! he cried, 'When they flogged me with the knout it was not so hard to bear as it is to see you now........yet you had pity on me and did not tell, For Christ's sake forgive me, wretch that I am! And he began to sob.'

'ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন। আমি হয়তো তোমার চেয়ে শতগুণ খারাপ।' আকসিওনভ বলে। তার হৃদয়ের বোঝা নেমে যায়। তার বাড়ি ফিরে যাবার বাসনা থাকে না। মাকার সেমেনিচ কর্তাদের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু আকসিওনভের খালাসের হুকুম যখন এসে পৌঁছায় ততদিনে সে মৃত।

দুর্ধর্ষ তাতারদের রুশ বন্দি ঝিলিনকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে সাহায্য করে তাদেরই ছোট একটি মেয়ে। তার নাম দিনা। মানুষের অন্তরে মানুষের প্রতি কী অপার করুণা। কার কী দেশ, কার কী জাতি, কার কী ভাষা এ প্রশ্ন মানুষের আপদে-বিপদে মানুষের দয়ামায়ার পথে প্রতিবন্ধক হয় না। তার অন্তঃকরণের

স্বাভাবিক মহত্ত্ব বাইরের ব্যবধান অতিক্রম করে। ঝিলিনের মতো দিনাও পাঠকের ভালোবাসা আকর্ষণ করে। তাতারদের সকলের চরিত্র মনুষ্যত্বের তুলিতে আঁকা হয়েছে। মানুষ হিসাবে তারা কেউ হীন নয়। শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ইসলামের ওপরেও।

'মানুষ কিসে বাঁচে' এই নামের উপকথাটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। এটি একটি অলৌকিক কাহিনী। এক গরিব কাঠুরের প্রাণ যায় গাছ কাটতে গিয়ে। দিন কয়েক পরে তার স্ত্রীরও মরণ আসন্ন হয় যমজ কন্যা প্রসব করতে গিয়ে। ভগবান তাঁর একজন এন্‌জেলকে পাঠান বিধবা জননীর আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। এনজেলের নাম মাইকেল। বিধবা জননী তার অসহায় শিশু দুটির প্রাণরক্ষার জন্যে আরো কিছু দিন সবুর করতে অনুনয় করে। মা-বাপ ছাড়া কি শিশু বাঁচতে পারে? মাইকেল ভগবানের আদেশ অমান্য করে স্বর্গে ফিরে যায়। তখন ভগবান তাঁকে আবার আদেশ দেন বিধবা জননীর আত্মাকে নিয়ে আসতে। তার পরে তাঁকে মর্তে নির্বাসন দেন। তাঁকে মানুষের সঙ্গে মানুষ হয়ে ততদিন দেহধারণ করতে হবে যতদিন না তিনি তিনটি প্রশ্নের উত্তর পান। তিনটি উত্তর হচ্ছে তিনটি সত্য। মানুষের ভিতরে কী নিবাস করে? মানুষকে কী দেওয়া হয়নি? মানুষ কিসে বাঁচে?

মাইকেল একদিন আসমান থেকে মাটিতে পড়ে দেখেন তাঁর ডানা নেই। তাঁর গায়ে কাপড় নেই। তিনি শীতে কাঁপছেন। একজন মুচি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে নিজে দুস্থ হলেও অচেনা-অজানা আর্ত মানুষকে দয়া করে বাড়ি নিয়ে যায়। তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ওঁকে অশন বসন আশ্রয় দেয়। কিন্তু কিছুতেই ওঁর পরিচয় পান না। মাইকেল সাইমনের কাছে শিখে মুচির কাজ করেন। ওঁর কাজের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়ায়। এক ধনী লোক একদিন গাড়ি করে এসে তাঁকে একজোড়া বুটজুতোর ফরমাস দেন। জুতোজোড়া যেন এক বছর মজবুত থাকে, ফেটে না যায়। মাইকেল কিন্তু বুট না বানিয়ে চটি বানান। সেইদিনই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয় ও তাঁর স্ত্রী বলে পাঠান বুটের দরকার হবে না, চটির দরকার হবে। শবযাত্রার সময় চটি পায়ে দেওয়াই প্রথা।

একদিন এক মহিলা আসেন। সঙ্গে যমজ কন্যা। তাদের জুতো বানাতে হবে। কিন্তু একটির পা খোঁড়া। মাইকেল চিনতে পারেন যে এই সেই যমজ মেয়েদের একজন যার পায়ের ওপর তার মা গড়িয়ে পড়েছিল মৃত্যুর সময়। মহিলাটির মুখে শোনা গেল শিশু দুটিকে তিনি নিজের সন্তানের সঙ্গে পালন করেন, নিজের সন্তান বেঁচে নেই, এরাই তার সন্তানের মতো প্রিয়। দেখা গেল

মা-বাপ ছাড়াও মানুষ বাঁচে। যা পেয়ে বাঁচে তা প্রতিবেশীর স্নেহমমতা। যা পরকে আপন করে। ভগবানই শিশু দুটিকে মহিলাটির হৃদয়ের বাৎসল্যরস দিয়ে বাঁচান।

এক এক করে তিনটি প্রশ্নের উত্তর পান মাইকেল। মানুষের অন্তরে দয়ামায়ার নিবাস। মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি কী তার প্রকৃত প্রয়োজন, নিত্যপরিধেয় বর্ষাকালস্থায়ী বুটজুতো না অদ্যপরিধেয় শবযাত্রার চটিজুতো। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আর-সকলের প্রেম প্রীতি স্নেহ্-মমতা। এই তিনটি সত্যের জ্ঞান লাভ করে মাইকেল মর্ত থেকে স্বর্গে ফিরে যান। যাবার সময় আবার তাঁর ডানা গজায়।

এইরকম আরেকটি উপকথা 'যেখানে প্রেম আছে সেখানে ভগবান আছেন।' মার্টিন বলে একটি গরিব মুচির স্ত্রী মারা যায়, পরে একমাত্র ছেলে মারা যায়। সেও আর বাঁচতে চায় না। কিন্তু একজন বৃদ্ধ তীর্থপথিক তাকে নিজের জন্যে না বেঁচে ঈশ্বরের জন্যে বাঁচতে উপদেশ দেন। যিনি তাকে প্রাণ দিয়েছেন তিনি তাঁর কাজের জন্যেই দিয়েছেন। এরপর মার্টিন জীবিকা অর্জনের পর অবসরকালে বাইবেল পাঠ করে। তাতেই তার শান্তি। খ্রিস্টের বাণী থেকে সে জানতে পায় যে তিনি অতিথি হয়ে আসেন, তখন কেউবা তাঁকে সমাদর করে, কেউবা নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকে। তাঁকে ফিরিয়ে দেয়।

একদিন ঘুমের ঘোরে সে শোনে, 'রাস্তার উপরে নজর রেখো। কাল আমি আসব।' পরের দিন সে প্রভু খ্রিস্টের পথ চেয়ে থাকে। তিনি আসেন না। কিন্তু আসে স্টেপানিচ নামে এক বুড়ো শ্রমিক। তার কাজ বরফ পরিষ্কার করা। শ্রান্ত ক্লান্ত শীতার্ত লোকটিকে ঘরে ডেকে এনে তাকে চাঙ্গা করবার জন্যে চা তৈরি করে খাওয়ায় মার্টিন। তারপর আসে একটি শিশু কোলে করে একজন স্ত্রীলোক। শীতের কাপড় নেই। যা পরে আছে তা দিয়ে শীত নিবারণ হয় না তার নিজেরই। তাই জড়ায় শিশুর গায়ে। ওদের ভিতরে ডেকে আনে মার্টিন। জানতে পায় ওদের খাওয়া হয়নি। ওদের খেতে দেয় মার্টিন। অভাবে পড়ে পরনের শাল পর্যন্ত বাঁধা দিতে হয়েছে। মার্টিন একটি পুরোনো আচ্ছাদন নেয়। আনা ছয়েক পয়সাও দেয় শালটা ছাড়িয়ে আনতে।

এরপরে মার্টিন লক্ষ্য করে এক ফলওয়ালী বুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেছে একটি ছেলের। বুড়ির ঝুড়ি থেকে একটা আপেল সরাবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে বাবাজী। মার্টিন গিয়ে ওদের ঝগড়া মেটায়। ছেলেটিকে বলে ক্ষমা চাইতে। বুড়িটিকে বলে ক্ষমা করতে। দু'জনাতে ভাব হযে যায়।

দিনটা তো এমনি করে কেটে গেল। কই, প্রভু তো দেখা দিলেন না। মার্টিন রাতের বেলা বাইবেল খুলে পড়তে বসে। তার মনে হয় সে শুনতে পাচ্ছে কাদের যেন পদধ্বনি। কে যেন কানে কানে বলছে, 'মার্টিন, মার্টিন, আমাকে চিনতে পারছ না?' মার্টিন বলে, 'কে?' কণ্ঠস্বর বলে, 'আমি।' অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে স্টেপানিচ। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। আবার মার্টিন বলে 'কে?' আবার কণ্ঠস্বর বলে, 'আমি।' অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে সেই স্ত্রীলোক আর তার শিশু। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। আবার মার্টিন বলে, 'কে?' আবার কণ্ঠস্বর বলে, 'আমি।' অধিকার থেকে বেরিয়ে আসে সেই বুড়ি আর সেই ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

বাইবেল খুলতেই চোখে পড়ে 'আমি ছিলুম ক্ষুধার্ত, তুমি আমাকে খাদ্য দিলে। আমি ছিলুম অচেনা-অজানা। তুমি আমাকে ঘরে নিয়ে গেলে।' পাতার নিচের দিকে নজরে পড়ে, 'যেহেতু তুমি এসব কাজ করলে আমার একজন ভাইয়ের বেলা, এমনকি যেজন সকলের ছোট তার বেলা, সেহেতু তুমি করলে আমারই বেলা।'

মার্টিন এবার বুঝতে পারে যে তিনিই এসেছিলেন বিভিন্ন রূপ ধরে। সে তাঁর সমাদর করেছে। অতিথির মতো।

মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় ছিল 'বোকা ইভানের কাহিনী'। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বোকা ইভানের মতো সৈন্যসামন্তও ধনসম্পদ অগ্রাহ্য করে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা রাজ্য চালানো যায়, রাজ্য রক্ষা করা যায়। টলস্টয় এটিকে বলেছেন রূপকথা। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর আদর্শ সমাজের রূপরেখা। এই রাজ্যও একপ্রকার ইউটোপিয়া। এখানে কেউ অভুক্ত থাকবে না। কিন্তু আগে খেতে দেওয়া হবে তাদেরই যাদের হাতে কড়া পড়ে গেছে হাত দিয়ে কাজ করতে করতে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার পর যা বাঁচবে তা দেওয়া হবে আমাদের মতো বুদ্ধিজীবীদের যারা লাঙল বা শাবল ধরে না, যাদের হাতে কড়া পড়ে না। ওদের আসন হবে খানা টেবিলে, আমাদের আসন হবে মেঝেতে। আমরাই ইতর জন। ওরা ভদ্র। টলস্টয়ের লেখায় সাধারণত হাস্যরস থাকে না, কিন্তু বোকা ইভানের কাহিনী হাস্যরসে ভরপুর। মিলিটারিস্ট আর ক্যাপিটালিস্টদের তিনি হাস্যকর করে তুলেছেন, সবচেয়ে হাস্যাস্পদ করেছেন যারা মস্তিষ্কের জাঁক করে তাদের।

(১৯৭৯)

সমর ও শান্তি

দুটি কথায় জীবন হচ্ছে সংগ্রাম ও বিশ্রাম।

ভারতীয়রাও এমনিতর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু ইউরোপীয়রা বলতে পারেন জীবনের প্রতি অবস্থায় তো দুঃখ সুখ জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পারম্পর্য কোথায়? পরম্পরা যদি থাকে তবে তা সংগ্রামের ও বিশ্রামের। সংগ্রামে যে কেবলই দুঃখ তা নয়, আর বিশ্রাম যে অবিমিশ্র সুখের তা-ও নয়। সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষভাবে সংগ্রাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং বিশ্রাম হচ্ছে বিশ্রাম। এবং দুই মিলিয়ে জীবন যদি হয় পদ্য তবে সংগ্রাম ও বিশ্রাম বোধহয় 'দুঃখ' ও 'সুখ' অপেক্ষা গাঢ়তর মিল!

ইউরোপের ইতিহাস-ইউরোপ-নির্দিষ্ট অর্থে মানবের ইতিহাস- মাত্র দুটি শব্দের উলটপালট খেলা। সমর ও শান্তি। কখনো রাজাতে রাজাতে, কখনো রাজাতে প্রজাতে, কখনো নেশনে নেশনে সমর যেন একটার পর একটা ঢেউয়ের ভেঙে পড়া। আর শান্তি যেন সেই ঢেউয়ের পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া। এ খেলা ফুরোয় না, ফুরোবার নয়।

টলস্টয় প্রণীত 'সমর ও শান্তি' নেপোলিয়নীয় যুগের ইতিহাস। ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থে নয়। তাই উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত। অথচ সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়ক-নায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক বল নায়িকা বল সে হচ্ছে স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণ মন সম্মান। অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাসের ভগ্নাংশ। এর বিষয় এর দেশ-কালরহিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হচ্ছে মানব-করতলরেখা।

রুশ সৈন্যরা অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আউস্টারলিৎসের রণক্ষেত্রে। হেরে যায়, 'হেরে

গেছি' এই ভ্রান্তিবশত। প্রকৃতপক্ষে তাদের হারবার কথা ছিল না। পরে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেকজান্ডারের সাক্ষাৎকার ঘটে, বন্ধুতা হয়। আবার ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে সেই মৈত্রী পর্যবসিত হলো শত্রুতায়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজভ দেখেন যে প্রতিরোধ করলে নিশ্চিত পরাভব। নেপোলিয়নের সৈন্যরা অবাধে মস্কো প্রবেশ করল, কিন্তু মস্কো জনশূন্য। একটিও রাশিয়ান তাদের সহযোগিতা করতে চাইল না। কেউ জানে না কে লাগিয়ে দিল শহরে আগুন। এরা বলে ওরা লাগিয়েছে। ওরা বলে এরা লাগিয়েছে। লুটপাট করে ফরাসিরা স্থির করল ফেরা যাক। কিন্তু যে বাঘ খাঁচায় ঢুকে পেট ভরিয়েছে ছাগ মাংসে তারই মতো দশা হলো তাদের। যতটা পথ এসেছিল ঠিক ততটা পথ ফেরার মুখে বহুগুণ মনে হলো। কুটুজভ ইচ্ছা করলেই রাস্তায় হানা দিয়ে তাদের নির্বংশ করতেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাতে তাঁর প্রবৃত্তি হলো না, তারা যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়া ত্যাগই করছে। তাঁর কোনো কোনো সৈনিক কসাকদের দলপতি হয়ে চোরের ওপর বাটপাড়ি করল। এইসব গেরিলা যুদ্ধে ও শীতে বরফে খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়নের গ্রাঁদ আমে কাহিল হয়ে পড়ল, সৈন্যদের অল্পই বাঁচল। তাও হলো পথি বিবর্জিত। নেপোলিয়ন চুপি চুপি দিলেন মস্ত এক লম্ফ।

এই হলো কাঠামো। সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্র-পাত্রীদের দিয়ে বড়ো বড়ো কাজ করাতেন। নতুবা যারা বড়ো বড়ো কাজ করেছে বলে ইতিহাসে লেখে তাদেরকেই করতেন পাত্র-পাত্রী। জাতীয় গৌরবের রঙ্ সমস্তটা হতো অতিরঞ্জিত। সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে দেখতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। সেনাপতিদের চাল দেওয়া, সৈনিকদের ঝড়ের মতো চলা, অধিক কৌশলীর জয়লাভ। পরাভূত পক্ষের ঐতিহাসিক ধরতেন উঠোনের দোষ নেপোলিয়নের সার্দকে করতেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঘটনাচক্রে কুটুজভ মস্কো রক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সাব্যস্ত করলেন, তাঁর পরামর্শ-পরিষদের সম্পূর্ণ অমতে। আর রোস্টোপশিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শহরের লোক যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, নেপোলিয়ন থাকতে সেখানে ফিরল না। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে টলস্টয় বলতেন, এ কি আমরা না-ভেবেচিন্তে করেছি? আমরা অনেক দিন থেকে মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছিলুম যে নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে দেশের ভিতরের দিকে টেনে আনব ও মস্কো খালি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখব।

টলস্টয় ঋষি। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন ঘটনা কেমন করে ঘটল, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। যারা খেলা করে তারা জানে কার কত দূর দৌড়। কিন্তু যুদ্ধে অপর পক্ষের সামর্থ্য পরিমাপ করবার কোনো ধ্রুব মান নেই। যারা লড়াই করে তাদের ঐটেই একমাত্র ভাবনা নয়, তারা সবাই বীরও নয়। তাদের নিজেদের ছোট ছোট ঈর্ষা-দ্বেষ। তাদের কারুর মনে পড়ছে ঘর-সংসার, কেউ গণনা করছে কবে মাইনে পাওয়া যাবে। সেনাপতিদের এক একজনের এক-এক মত, তাদের সবাইকে এক মতে কাজ করানো প্রধান সেনাপতির নিত্য সমস্যা। পদাতিকদের অনুপ্রেরণা জয়গৌরব ততটা নয় যতটা লুতরাজ। মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও বীরপুরুষেরা লুটের মাল আঁকড়ে থাকে। যুদ্ধ হয়, একবার কোনো মতে শুরু করে দিলে আপনা-আপনি। থামে হয়তো একটা উড়ো কথায়। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা হেরে গেছি।' অমনি সবাই ভঙ্গ দিল।

কেন যে যুদ্ধ হয়, কেন যে মানুষ মারে ও মরে, কী যে তার অন্তিম ফল টলস্টয় তার সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। নেপোলিয়ন হুকুম করলেন, 'যুদ্ধ হোক', আর অমনি যুদ্ধ হলো এই সুলভ ব্যাখ্যায় তিনি সন্দিহান। নেপোলিয়ন নিয়তির বাহন, তাও একটা ঐরাবত কি উচ্চৈঃশ্রবা নন, প্রতিভা তাঁর নেই। মস্কোতে তিনি আগাগোড়া নির্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। সেই শহরে খাদ্য মজুত ছিল ছয় মাসের। কিন্তু নেপোলিয়ন তার হিসাব রাখলেন না। সৈন্যরা লুটপাট করে তছনছ করল। মস্কোর ধনসম্ভার তাদের লোভ জাগিয়ে তাদেরকে এত দূরদেশে এনেছিল। সেই লোভের তাণ্ডব নাচ চলল। নেপোলিয়ন মোরগের মতো নিশ্চিত জানতেন যে, নাগরিকরা তাঁর লম্বা চওড়া ইস্তাহার পড়ে ফিরবে, আবার দোকনপাট বসাবে। গ্রামিকরা আসবে মাছ, তরকারি বেচতে। তাদেরকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন যে, যুদ্ধে যেমন তিনি অপরাজেয় শান্তিকালেও তেমনি তিনি প্রজারঞ্জক।

রাশিয়ার জনগণকেই টলস্টয় দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে উপলব্ধি করল নিয়তির অভিপ্রায়। তাই মূঢ় রোস্টোপশিনের অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করে শহর ছেড়ে দিল। শহরে আগুন দিল কে তা কিন্তু বলা যায় না। হয়তো রাশিয়ানরা, হয়তো ফরাসিরা। যে-ই দিক সে নিয়তির ইঙ্গিতে দিয়েছে। বোঝেনি কিসের ফল কী দাঁড়াবে।

শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করব, ফিরব না মস্কোতে এই যে তাদের অপ্রতিরোধের সংকল্প এ-ও কারুর নির্দেশে বা শিক্ষায় নয়। এ-ও তারা

একজোট হয়ে পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে করেনি। এ তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আদেশ। এমন যদি না হতো তবে সম্রাট বা সেনাপতিদের ইচ্ছা নেপোলিয়নের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রলয় বাধাত, প্রলয়ঙ্করের করতালি তো এক হাতে বাজে না।

শেষ জীবনে টলস্টয় যে জনগণের স্বভাববিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন, অপ্রতিরোধতত্ত্বের গোস্বামী হবেন, তার পূর্বাভাষ তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। নামহীন-পরিচয়হীন মহাজনতায় আপনাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাধনা। পারেননি, এমনি উগ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বদ্ধমূল আভিজাত্য উন্মূল হলো না। তবু তাঁর দানবিক প্রয়াস একবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে। গান্ধীজীর জীবনাদর্শে। টলস্টয়কে দ্বিখণ্ডিত করে কেউ নিয়েছে তাঁর যৌবনের অনবদ্য শিল্পিত্ব। কেউ নিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের অপ্রতিরোধতত্ত্ব।

কিন্তু এই যে তাঁর জনগণের সহজ বিচারের প্রতি আস্থা এই তাঁর উভয় বয়সের, উভয় প্রতিকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের সংকেত। শিল্পী-ঋষি ও সাধু-ঋষি মূলত ঋষি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের কোন রহস্য ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে এই যে, যাবতীয় ঘটনার যথার্থ পাত্রপাত্রী ইতিহাস, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নন। নাম-পরিচয়হীন নির্বিশেষ জনতা যা করে তাই হয় এবং যা করে তা নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালি নয়, তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন আমাদের বোধের অতীত বলে আমরা একদা তাকে স্থানু মনে করেছিলুম তেমনি নিয়তির ইচ্ছায় কাজ করতে থেকেও আমরা তার সম্বন্ধে অচেতন, আমরা ঠাওরাচ্ছি আমরা ইচ্ছাময়।

সমর থেকে ওঠে নিয়তির কথা। তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির। বিচিত্র সংসারের ধারাবাহিকতায় কত রস, কত রূপ। যুদ্ধ চলেছে নেশনে নেশনে। কিন্তু অলক্ষিতে বালিকা হয়ে উঠেছে বালা, বালা হয় উঠেছে নবযুবতী। অন্তরীক্ষে শীতের সূর্য সুধাবর্ষণ করে যাচ্ছে, আকাশ ঘন নীল। কে বলবে যে এই সুন্দরী ধরণী একদিন হবে রণক্ষেত্র, বারুদের ধূমে ও গন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুপক্ষীর হবে শ্বাসরোধ, পাতা ও ফুল যাবে বিবর্ণ হয়ে? টলস্টয়ের এই গুণকে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন আইডিল, সুখসরলতার ছবি। এক হিসাবে তা সত্য। সহজ, প্রসন্ন জীবন। বিশেষ অভাব-অভিযোগ নেই। নেই তেমন কোনো দ্বন্দ্ব কারুর অতি বড় সর্বনাশ ঘটে না, জীবনদেবতা সকলেরই শেষ নাগাদ একটা সদ্ব্যবস্থা করেন। কাউকে দেন সুমধুর মৃত্যু, মুখে হাসিটি লেগে থাকে।

কাউকে রাখেন চিরকুমারী করে, নিজের নিষ্ফলতায় সন্তুষ্ট। কেউ আরম্ভ করেছিল বিশ্বের ভাবনা ভেবে। মরতে মরতে বেঁচে গেল। তারপর বিয়ে করল, সুখে থাকল।

আধুনিক পাঠকের এতটা শান্তি বিশ্বাস হবে না। তবে এটুকু পরিতোষ হবে যে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায় ছিল না ঋষির। আর এও না মেনে উপায় নেই যে প্রত্যেকটি কাল্পনিক চরিত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্রের মতো উৎরেছে। তার মানে ওরা আস্ত মানুষ, কবি ওদের দেখেছেন সকলের মাঝে, দেখিয়েছেন যথাযথরূপে। ওরা থাকলেও থাকতে পারত ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসে থাকলে বিশ্বাস করতুম ওদের জীবনযাত্রার শান্তি।

কথা হচ্ছে সমরের মতো শান্তিকালেও টলস্টয় পড়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ। সমরের যেমন নিয়তি, শান্তির তেমনি সহজ বিকাশ, বিতর্ক অস্তিত্ব। দ্বন্দ্বের স্থান রণাঙ্গনে। গৃহে বড়ো জোর একটু মান অভিমান, সহজ কলহ। একটু ব্যঙ্গ, একটু রঙ্গ। রাগ হলে বা রাগ হওয়া উচিত বলে মনে করলে, একটা ডুয়েল। তাতে মরেও না শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষ।

শান্তি যে আজ আমাদের দিনে সমরের নামান্তর, প্রকারান্তর বলে গণ্য হবে তা তো উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সূচিত হয়নি। বিশেষত রাশিয়ায় এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের গণ্ডী কালচিহ্নিত। যেমন খাপ তেমনি তরবারি। তথাপি সেকালের চিন্তায় জমিদার ও চাষার সম্বন্ধ কেমন হবে সে জিজ্ঞাসা ছিল।

(২)

সমসাময়িক সমস্যার চেয়ে টলস্টয়কে ঢের বেশি আকুল করেছিল সনাতন জীবনরহস্য। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে? এর এক-একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক-একজনের চরিত্রে দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে নাম করা যায় নাটাশার, মারিয়ার, সোনিয়ার, হেলেনের। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় অ্যান্ড্রুকে, পিটারকে, নিকোলাসকে। যাদের অগ্রাহ্য করলুম তারা কেউ উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা শতাবধি। এত রকম এত ব্যক্তি অন্য কোন গ্রন্থে আছে? ডস্টয়েভ স্কিও টলস্টয়ের পিছনে পড়ে যান।

নাটাশাকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তার শৈশব সারা হয়ে গেছে অথচ কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। সে দেখতে তত সুশ্রী নয়, বরং শ্রীহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে উচ্ছলিত প্রাণ। তখনো তার পুতুল খেলার

অভ্যাস ভাঙেনি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। তার সে হাসি সংক্রামক। এই মেয়ে বছর চারেক পরে হয়েছে ষোড়শী, ভাবাকুলা, সুদর্শনা। কিন্তু রয়েছে তেমনি প্রাণবতী। সামাজিক নৃত্যে সে এমন আনন্দ পায় যে তার নিষ্পাপ চিত্ত সকলের আনন্দ কামনা করে। তার উল্লাস যেন কোনো অন্দরার, তা দিকে দিকে সৃষ্টি করে উল্লাস। তার অখলতা, তার অকৃত্রিমতা, তার সরল মাধুরী তার প্রতি আকৃষ্ট করল অ্যান্দ্রুকে। অ্যান্দ্রু উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয়, উচ্চমনা। বয়সেও বড়ো। দেশের মঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ছিল তাঁর ধ্যান। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহের স্ত্রী তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন না। সামাজিকতার অশেষ তুচ্ছতায় তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত খুচরো খরচ হয়েছেল, বাজে খরচ। বিরক্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করে তাঁর তাতেও অরুচি ধরল। যাকে আদর্শস্থানীয় বলে বিশ্বাস করেছিলেন সেই নেপোলিয়নকে নিকট থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হলেন। প্রশান্ত নীল আকাশের নিচে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হলো তাঁর বুদ্ধিগম্য যাবতীয় বিষয় অসার, সার কেবল ঐ অসীম বিশ্বরহস্য। এমন যে অ্যান্দ্রু তাঁরও নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করল নাটাশার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণপ্রবাহে ভেসে। তার নেই লেশমাত্র মলিনতা, সে ঝরনা। এক বছরের জন্যে অ্যান্দ্রু দেশের বাইরে গেলেন, ফিরে এসে নাটাশাকে বিয়ে করবেন। এই এক বছরে নাটাশা তাঁর প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠল। এলো তার কুগ্রহ আনাতোল। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে প্রতারকের কবলে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল। বাধা পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। বেঁচে গেল কিন্তু বদলে গেল। অ্যান্দ্রু দেশে ফিরে যা শুনলেন তাতে তাঁর জীবনের স্পৃহা লোপ পেল, নারীর কাছে তিনি কোনো রূপ মহত্ত্ব প্রত্যাশা করলেন না, এত দুর্বল তারা। তিনি আবার গেলেন যুদ্ধে, এইবার মৃত্যু কামনা করে। আহত হয়ে আনীত হলেন। ঘটনাচক্রে নাটাশাদের আশ্রয়ে। মরণকালে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হলো দিব্য ভাবে। তিনি ক্ষমা করলেন, তিনি ভালোবাসলেন, প্রাণীমাত্রকে, সংসারকে। তাঁর মনে ব্যর্থতার নিত্য খেদ রইল না। অনুতপ্তা সেবিকা প্রিয়াকে আশীর্বাদ করলেন।

নাটাশাকে তার শৈশব থেকে ভালোবাসত পিটার। লোকটা কেবল যে লাজুক, ভালোমানুষ, কিম্ভূতকিমাকার, মাথাপাগলা তাই নয়, নামগোত্রহীন সত্যকাম। তাই কাউকে কোন দিন জানায়নি ভালোবাসার কথা। হঠাৎ মারা গেলেন কাউন্ট বেসুকো, উত্তরাধিকারী হলো পিটার, বিরাট ভূসম্পত্তির তথা পদবির। তখন তাকে লুফে নিল নাটাশাদের চেয়ে উদ্যোগসম্পন্ন প্রতিপত্তিমান কুরাগিন বংশ। তার বিয়ে হলো যার সঙ্গে সে অসামান্য রূপবতী, সোসাইটির

উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, হেলেন, কোনো পক্ষে প্রেম নেই। বিভবের সঙ্গে সৌন্দর্যের বিবাহ। দুজনেই পরম অসুখী হলো। হেলেন খুঁজল অমন অবস্থায় ওরূপ সমাজের রানীমক্ষিকারা যা খোঁজে। আর বেচারা পিটার হলো ফ্রিমেসন। চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করতে চেষ্টা করল, বিশ্বকল্যাণ-ব্রতরত। দোষের মধ্যে মদটা খায় অপরিমিত। তার সেই ভালোবাসা তার অন্তরে রুদ্ধ থাকে। নাটাশার সঙ্গে তার সহজ বন্ধুতা। নাটাশা তাকে সরল জন্তুটি বলে সখীর মতো বিশ্বাস করে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন পিটারের ধারণা জন্মাল যে, বাইবেল যে রাক্ষসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে নেপোলিয়নই সেই রাক্ষস এবং তাকে হত্যা করবে যে সে আর কেউ নয়, সে আমাদের পিটার, যে একটা বন্দুকও ছুড়তে জানে না। পিটারের প্রয়াসের শেষ ফল হলো এই যে পিটার অন্যান্যদের সঙ্গে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়াল। তার চোখের সুমুখে মানুষ মরল ঘাতকের গুলিতে। তারও ওপর গুলি চলবে এমন সময়ে তার প্রাণদণ্ড মকুফ হলো, সে চলল বন্দি হয়ে ফিরন্ত ফরাসিদের সঙ্গে। কৃষকদের সাহায্যে অন্যান্য বন্দিদের সহিত তাকেও উদ্ধার করল ডেনিসোভ ডোলোগোভ প্রভৃতি গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে যে দুঃখ আমাদের পাওনা নয় সেই দুঃখকে কেমন ভক্তির সহিত গ্রহণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত কারাটাইয়েভ নামক একটি পরম দুঃখী ঈশ্বরবিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যক্ষ করে পিটারের গভীর অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছিল। শৌখীন মানবহিত আর তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছিল না। সে পথ পেয়েছিল। বিষাদিনী নাটাশাকে বিয়ে করে—ততদিনে হেলেন মরেছিল— সে দস্তুরমতো সংসারী হলো। নাটাশা আবার সেই আনন্দময়ী। প্রকৃতি নিজে তাকে সহজ আনন্দ জোগায়, উদ্ভিদকে যেমন রস। সে কালক্রমে ফলভারাবনত পূর্ণ-বিকশিত পাদপের মতো প্রসরিত, সমৃদ্ধ হলো। কে তাকে দেখে চিনবে যে এ ছিল একদিন তন্বী আলোকলতা! তবু তাই তার প্রাকৃতিক পরিণতি। তা নইলে যা হলো সেটা তার বিকৃতি। নাটাশা টলস্টয়ের মানসী নারী। সে ভালো। কিন্তু সজ্ঞানে ও সাধনার দ্বারা নয়। শিক্ষা দ্বারা নয়। নীতির চুলচেরা তর্ক তার মনে ওঠে না। তার প্রাণ যা চায় সে তা-ই চায়। তার প্রাণ যা চায় তার ফলে অনর্থ ঘটলে সে তা ভোগে। নালিশ করতে চায় না।

অ্যান্ড্রুর বোন মারিয়া হচ্ছে কতক তার রূপহীনতার প্রতিক্রিয়ায় কতক তার কঠোর স্বভাব জনকের তাড়নায় তপস্বিনী। তার সমবয়সিনীরা যখন খেলা

করছে, লীলা করছে, শিকার করছে দুই অর্থে, মারিয়া তখন জ্যামিতিক পড়া তৈরি করছে আর করছে লুকিয়ে লুকিয়ে অধ্যাত্মচর্চা। যা অমন দুঃখিনী হলে নারীমাত্রেই করে থাকে। আপনাকে ভাগবত জীবনের যোগ্য করছে নিষ্ঠার সহিত, বিবাহের তো প্রত্যাশা নেই। তা বলে আশা কি মরেও মরে! কতবার নিরাশ হলো। অবশেষে নাটাশার ভাই নিকোলাস তার পৈত্রিক সম্পত্তির খাতিরে তাকে বিয়ে করল, অবশ্য বিয়ের আগে তাকে বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জিতে। তাদের বিয়ে বেশ সুখেরই হলো। মারিয়ার দীর্ঘাচরিত সংযম ও সাধুতা তাকে শুদ্ধ সুবর্ণের আভা দিয়েছিল। তার রূপহীনতাকে ঢেকেছিল সেই আভা।

নিকোলাস নাটাশারই মতো প্রাণময়, তবে সহাস্য নয় সুগম্ভীর। তার সব কাজে হাত লাগানো চাই, উৎসাহ তার অদম্য, ব্যগ্রতা তার মজ্জাগত। ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া খরিদ, তরুণ সৈনিকের ভাবনাশূন্য জীবনের হাজার ভাবনা, শিকার, জুয়া এই সব তার বহির্মুখিত্বের নানা দিক। তাকে ভালোবাসে তাদের পরিবারের আশ্রিতা একটি মেয়ে, সোনিয়া। নিকোলাসও তাকে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা তার অন্যান্য কাজের মতো ছেলেমানুষী। কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে, কিন্তু সোনিয়ার অপরাধ সে নির্ধন। তাকে বিয়ে করলে নিকোলাসদের নষ্ট সম্পত্তি ফিরবে না। তার বাবা জুয়ায় সব হারিয়ে বসে রয়েছেন। নিকোলাসের মায়ের পীড়াপীড়িতে সোনিয়া তাকে তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সুখ বিসর্জন দিল। নিকোলাস বর্তে গেল, সে তো কিছুতেই তার পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না, অথচ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবার মতো বেইমান সে নয়। সোনিয়া এই কাব্যের উপেক্ষিতা।

ডোলোগোভ নিকোলাসের বন্ধু। কিন্তু দিব্যি বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জুয়াতে ভীষণ হারিয়ে। লোকটা অসাধারণ সাহসী, অথচ অবাধ্য। তার মনে একটা বড়ো দুঃখ সে গরিব। তাতে তাকে নির্দয় করেছিল। তার আর একটা বৃহৎ ক্ষোভ সে একটিও নারী দেখল না যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, পূজা করতে পারে। তার ধারণা রানী থেকে দাসী পর্যন্ত প্রত্যেক রমণীকে কেনা যায়। সে যে বেঁচে আছে শুধু তার মানসীকে হয়তো একদিন দেখতে পাবে এই অসম্ভব আশায়। ততদিন সে শয়তানি করবে। করবে গুণ্ডামি। তার বিধবা মা আর কুব্জা বোন আর গুটি কয়েক বন্ধু ছাড়া সবাইকে সে বেখাতির করবে।

টলস্টয়ের বর্ণনাকুশলতা এমন যে পদে পদে মনে হতে থাকে টলস্টয় স্বয়ং এসব দেখেছেন। এসব জায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, মন্ত্রণাসভায়,

দরবারে, অভিজাত মহলে, ফ্রিমেসনদের আড্ডায়, গ্রামের বাড়িতে, শিকারের পশ্চাতে, নাচের মজলিসে, চাষাদের সঙ্গে, বন্দিদের সঙ্গে, গেরিলা দলে—সর্বঘটে তিনি আছেন। কল্পনার এই পরিব্যাপ্তি, সহানুভূতির এই প্রসার বিশ্বসাহিত্যে বিরল। অবশ্য সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে তাঁর চিত্তের প্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি হয়তো শেষ বয়সে তাদেরই দিকে সম্পূর্ণ হেলতেন না। তারপর এত খুঁটিনাটি ভালোবাসতেন বলে তার প্রতিক্রিয়াবশত শেষের দিকে একেবারে ও জিনিস বর্জন করলেন। এক চরমপন্থা থেকে অপর চরমপন্থায় চললেন। টলস্টয়ের জীবনের তথা আর্টের ট্রাজেডি এই। আলোচ্যগ্রন্থে তিনি যাকে জয়যুক্ত করেছেন সে পিটার, নাটাশাযুক্ত পিটার। কারাটাইয়েভ মরণের পূর্বে তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি তার কানে বাজতে থাকে। জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আছে ভগবানের অস্তিত্বকে জানবার আনন্দ। জীবনকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসা।

(১৯৩৪)

টলস্টয় ও বিনু

টলস্টয়ের কাছে বিনুর শিক্ষানবিসি স্টাইলের জন্য নয়, স্টাইলকে অতিক্রম করার জন্য। শিক্ষনবিসির শুরু কবে, তা মনে নেই। সারা এখনো হয়নি। লেখকের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে পাঠকের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, মাঝখানে কোনো প্রাচীর রাখতে চায় না। অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানও তাকে পীড়া দেয়। সাধকের মতো লেখকেরও শেষ কথা, শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। তন্ময় হওয়ার আগে স্টাইল একটা সহায়, কিন্তু তন্ময় হওয়ার ক্ষণে স্টাইর এটা বাধা। কুঞ্জের দ্বার অবধি গিয়ে সখী বিদায় নেয়, নতুবা সে সখী নয়, সতীন।

টলস্টয়ের কিছুই গোপন নেই, তিনি কিছুই হাতে রাখেননি, যখনকার যা তখনকার তা পাঠকের হাতে সঁপে দিয়েছেন, জীবন-যৌবন পাপ-পুণ্য জ্ঞান-অজ্ঞান। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। বোধহয় পেরেছেনও। এর জন্যে তাঁকে অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে। সাধকের মতো লেখকেরও শত্রু তার বিভূতি, তার অলঙ্কারের ঝঙ্কার। তার অহঙ্কারের টঙ্কার। ঈশ্বরের কাছে যে ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়ায় সে কি তাঁর আলিঙ্গনের জন্যে জায়গা রেখেছে? সর্বাঙ্গে জড়োয়া ও কিংখাব। সেসব যে খুলে ফেলে দিয়েছে, তাদের আসক্তি কাটিয়েছে, সেই তো উত্তমা নায়িকা, উত্তম সাধক। তেমনি উত্তম লেখক। তার অন্তিম পাঠক সব মানুষের অন্তরাত্মা। 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ।' সেই মানুষের প্রেম পেতে হলে সব ছাড়তে হয়।

এ যে কেবল স্টাইলের বেলায়, তা নয়। টলস্টয় তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে গৃহত্যাগ করেছিলেন। জীবনের কাছে সত্যরক্ষার জন্যে তেমন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। যার জীবন সত্য নয়, তার লিখন সত্য হবে কোন্ জাদুবলে? সমাজের চিন্তা থেকে কোন এক সময় জীবনের চিন্তা বিনুকে পেয়ে বসল। সেখানেও টলস্টয় হলেন তার দৃষ্টান্ত। কী যে সার, কী যে অসার, এ সম্বন্ধে

টলস্টয়ের সঙ্গে তার নির্ণয়ের সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু যুবক টলস্টয়ের সঙ্গে। বর্ষীয়ানের সঙ্গে তার মতভেদই অধিক, কিন্তু সেও স্বীকার করে নিয়েছে যে সাযুজ্যেই মুক্তি। লেখকের মোক্ষ পাঠকের সঙ্গে সাযুজ্য। পাঠক হচ্ছে দৃশ্যত 'পিপল' বা জনগণ। নেপথ্যে সব দেশের সব কালের পাঠকসত্তম। 'সেই মানুষ।'

(১৯৪৪)

টলস্টয়, গান্ধী ও আমি

আমার যখন সতেরো কি আঠারো বছর বয়স তখন আমি আবিষ্কার করি যে আমি অন্তর থেকে নৈরাজ্যবাদী। আমার পছন্দ রাষ্ট্রহীন অস্তিত্ব। সৈন্য নেই, পুলিশ নেই, নেই ম্যাজিস্ট্রেট, নেই আদালত। পরিবার, বিবাহ, জাত, শ্রেণী; এগুলিতে আমার বিশ্বাস অল্পই। সম্পত্তি, মালিকী স্বত্ব, উত্তরাধিকার, টাকা খাটানো– এগুলোরও কোনো অর্থ হয় না আমার কাছে।

অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে আমিই হয়ে দাঁড়াই রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ। ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে পুলিশ নিয়ে কাজ করি। জজ হয়ে আইন প্রয়োগ করি। আবার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফৌজ নিয়ে কাজ করি, স্বরাজের পরে অর্ধসামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করি। বেশ বুঝতে পারি যে আমার জীবিকা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার ওপর। যে ব্যবস্থা বৈদেশিক শাসনের চেয়েও গভীর, ধনতন্ত্রের চেয়েও বনেদী, ফিউডালিজমের চেয়েও প্রাচীন।

তবে কি আমি আমার নৈরাজ্যবাদ বিসর্জন দিই বা অতিক্রম করি? না। বরঞ্চ উপলব্ধি করি যে নৈরাজ্যবাদের মধ্যে রয়েছে আরো উন্নত আরো তৃপ্তিকর ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি, যদি নৈরাজ্যবাদের পূর্বে একটি বিশেষণ বসানো হয়। বিশেষণটি 'অহিংস'। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে যে আগে আসবে অহিংসা, তার পরে আসবে নৈরাজ্যবাদ।

এমনি করে আমি অন্তরের প্রত্যয় থেকে হলুম অহিংস নৈরাজ্যবাদী। এ ক্ষেত্রে আমার গভীর সাযুজ্য ছিল টলস্টয়ের সঙ্গে, গান্ধীর সঙ্গে। একই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান আমরা। সে বিশ্বাস দাঁড়িয়ে ঋদ্ধ অভিজ্ঞতার অচলের ওপরে। রণজর্জর জগতে আমরা ধরে আছি সেই নিশ্চিত বিশ্বাসকে যে বিশ্বাস স্থির থাকবে সব বিপর্যয়ের পরেও, সব ভাঙাচোরার পরেও।

কিন্তু এর মানে কি এই যে আমি টলস্টয়বাদী বা গান্ধীবাদী? না। তার কারণ তাঁদের সঙ্গে দু'তিনটি জায়গায় আমার গুরুতর মতভেদ আছে।

প্রথমত, আমার কাছে আর্ট হচ্ছে নিজেই নিজের লক্ষ্য মহত্তর লক্ষ্যের উপলক্ষ হতে গেলে আর্ট তার আত্মাকে হারায়। অহিংস নৈরাজ্যবাদী হিসাবে আমার আত্মাকে পেতে গিয়ে আর্টিস্ট হিসাবে আমি আমার আত্মাকে হারাতে রাজি নই। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় শিল্পীকে ছেড়ে দিতে হবে তার নিজের মতো করে বাঁচতে, তার নিজের মনের মতো করে সৌন্দর্য প্রতিমা গড়তে। তার জীবিকার জন্যে সে এমন লোকের অনুগ্রহনির্ভর হবে না যারা শিল্পকে শিল্প বলে মূল্য দেয় না। এ জায়গায় আমি টলস্টয় ও গান্ধীর মতো আপসহীন, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত, প্রেম বলতে আমিও মানবপ্রেম বুঝি, যেমন বুঝতেন টলস্টয় ও গান্ধী। কিন্তু আমি প্রেম বলতে আরো বুঝি পুরুষের প্রতি নারীর ও নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম। টলস্টয়ের সারজীবন গেল এর সঙ্গে যুঝতে। গান্ধীও বৃথা চেষ্টা করলেন সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে। টলস্টয়ের অপূর্ব জ্ঞান সত্ত্বেও, গান্ধীর নিখুঁত শিভ্যালরি সত্ত্বেও নারীকে তাঁরা কেউ চিনতেই পারলেন না। অচেতনভাবে নারীকে তাঁরা দেন অধীনতার ভূমিকা, যেমন দিয়ে এসেছেন ধার্মিক পুরুষেরা এতকাল মাতৃত্বের নামে। গৌরবে দিশাহারা হয়ে। আসলে কিন্তু নারীকে তাঁরা নরকের মতো ডরাতেন। তাঁদের সহজাত সংস্কার তাঁদের বলত, নারী ও পাপ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। আমি এ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। সমাজব্যবস্থায় মানবপ্রেম ও নর-নারীর প্রেম সমান গুরুত্ব পাবে।

তৃতীয়ত, টলস্টয় বা গান্ধী কেউ বিশ্বাস করতেন না আধুনিক সভ্যতায়। আমি বিশ্বাস করি। এই সভ্যতার কতকগুলি মূল্য যে মন্দ তা আমিও মানি। কিন্তু কতকগুলি মূল্য আছে যা ভালো, যা উৎকৃষ্টতর, যা অনন্য। এই মার্গই বিবর্তনের মার্গ! এই মার্গে চলতে চলতে আমরা মন্দকে অতিক্রম করতে পারি। যন্ত্রপরায়ণ, নাগরিক, প্রকৃতির সঙ্গে যুধ্যমান, দুর্বলের যম নির্মমভাবে হিংস্র এই সভ্যতা নিজের হাতেই মরবে, যদি না এর অন্তরের পরিবর্তন হয়। তা বলে এর কীর্তিগুলো কেবলমাত্র আধিভৌতিক নয়। আধ্যাত্মিকও বটে। এ সভ্যতা আমাদের বহু পরিমাণে দিয়েছে অভাব থেকে, উৎপীড়ন থেকে, অতীত-উপাসনা থেকে, পারলৌকিকতা থেকে, সামাজিক অবিচার থেকে মুক্তি। বহু পরিমাণে সাম্য, বহু পরিমাণে জ্ঞান। বহির্বিশ্বের জ্ঞান তো বটেই, অন্তর্জগতের জ্ঞানও। সত্যই যে ভগবান, এটি আধুনিক সভ্যতারই দান। এমনকি অহিংসার নতুন ব্যাখ্যাও আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে। টলস্টয় ও গান্ধী উভয়েই আধুনিক সভ্যতার সন্তান। আমিও। কিন্তু সজ্ঞানে।

(১৯৫৩)

টলস্টয়ের গৃহত্যাগ

টলস্টয়ের শেষজীবন বাইরে বিশ্বব্যাপী যশের ও শ্রদ্ধার, ঘরে অকল্পনীয় অশান্তির। একদা যা ছিল সুখের নীড় তাই হয়ে দাঁড়ায় কোঁদলেয় খোঁয়াড়। তিনি নিজেও এর জন্যে কম দায়ী ছিলেন না। তিনি বেঁচে থাকতে সম্পত্তির একটা বিলিব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা স্ত্রীর সম্মতিক্রমে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে যে উইল সম্প্রদান করেন তা স্ত্রীকে না জানিয়ে ও না দেখিয়ে। উইলটা বার বার তিনবার পাল্টানো হয়। উইলের এক্‌জিকিউট্রিক্স করা হয় কন্যা আলেবজান্দ্রাকে। আলেবজান্দ্রার মৃত্যু হলে কন্যা টাটিয়ানাকে। স্ত্রীকে এক্‌জিকিউটিক্স করা হয়নি। স্ত্রীর মনে সন্দেহ ছিল যে স্বামী উইল করেছেন। তিনি সেটা স্বামীর শোবার ঘরে ঢুকে তাঁর কাগজপত্র ঘেঁটে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন গভীর রাত্রে। স্বামী টের পেলে বলেন, 'তুমি কেমন আছো দেখতে এসেছি।' স্বামী বোঝেন সবই, কিন্তু না বোঝার ভান করেন। দু'জনের মনেই দু'জনকে অবিশ্বাস। এর একমাত্র সত্যিকার প্রতিকার স্ত্রীকে উইলটা দেখানো। কিন্তু তাহলে হয়তো তিনি আত্মহত্যা করতেন। আত্মহত্যার হুমকি তিনি প্রায়ই দিতেন। প্রকাশ্যে। সত্য যাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো সেই টলস্টয় সত্যের কাছ থেকে পলায়ন করলেন। তার গৃহত্যাগ সেই পলায়ন।

ওদিক আরেক জট পাকিয়েছিলেন তিনি তাঁর অপ্রকাশিত যাবতীয় ডায়েরি ও পাণ্ডুলিপি তাঁর পট্টশিষ্য চার্টকভের জিম্মা দিয়ে। চার্টকভ তা পরে প্রকাশ করতেন। ডায়েরির অনেক স্থানে স্ত্রীপুত্রকন্যার বিরুদ্ধে কটূক্তি ছিল। চার্টকভকে বলা হয়েছিল ওসব বাদ দিতে। তিনি নিজেও ডায়েরি চেয়ে নিয়ে আপত্তিকর পৃষ্ঠাগুলো খুলে নেন। কিন্তু নষ্ট করেন না। পরে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। স্ত্রীর দাবি মেনে নিয়ে টলস্টয় চার্টকভের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে নিজের হেফাজতে রাখেন। এ ছাড়া তিনি একটি গুপ্ত ডায়েরিও রাখতেন

পোশাকের ভিতরে লুকিয়ে। এই লুকোচুরি অমন একজন সতনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অশোভন। সমস্তক্ষণই কিনা স্ত্রীপুত্রকন্যার ভয়ে। যিনি জারকে ভয় করতেন না, চার্চকে ভয় করতেন না তিনি নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যাকে ভয় করতেন। দুটিকে বাদে। সে দুটি টলস্টয়ান বা টলস্টয়পন্থী। অন্যেরা টলস্টয়কে ভালোবাসলেও তাঁর মতবাদকে ভালো মনে করতেন না। পুত্র হলেও তো রীতিমতো পিতৃদ্রোহী। তার ধারণা সেও একজন মহান লেখক হতে পারত যদি না তার পিতা পূর্বে মহান লেখক হয়ে তার পথ রোধ করতেন।

'রেজারেকশন' তাঁর স্ত্রী একেবারেই পছন্দ করতেন না। অথচ ও বই থেকে আয় যখন দুখোবরদের দেশত্যাগের তহবিলে দান করা হয় তিনি এই বলে আক্ষেপ করেন যে তাঁর ছেলেমেয়েরা সাদা পাউরুটি খেতে পাচ্ছে না, আর তাদের বাপ কিনা কোথাকার হতভাগা বিদ্রোহী 'বিদেশী' দুখোবরদের জন্য ঘরের টাকা খয়রাত করছেন। আয় সেটাও কিনা নিজের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে।

ঘোষিত নীতিটা এই ছিল যে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত রচিত গ্রন্থের কপিরাইট টলস্টয় পরিবারের। তাঁরাই রয়ালটি পাবেন। তার পরে রচিত গ্রন্থের ওপর কপিরাইট থাকবে না। যে কোনো প্রকাশক যে কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারবেন। টলস্টয়কে বা পরিবারকে রয়ালটি দিতে হবে না। কিন্তু এ নিয়ে দারুণ গণ্ডগোল বেধে যায়। টলস্টয় ভেবেছিলেন ১৮৮১ সালের পর থেকে যা লিখবেন তা লাভের জন্য লেখা নয়, প্রচারের জন্যে লেখা। দেখা গেল তাঁর প্রবন্ধের বই বিক্রি করে লাভ হয় না। তাঁর প্রধান শিষ্য একটা প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করেন। সেখান থেকে তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। লাভের জন্যে নয়। তা বলে লোকসান দিয়ে তো প্রকাশন সংস্থা চালানো যায় না। প্রধান শিষ্য চার্টকভ (দুখোবর নন, টলস্টয়ের মতোই অভিজাত) টলস্টয়কে অনুরোধ করেন নতুন উপন্যাস লিখে তাঁর হাতে দিতে। উপন্যাস প্রকাশ করলে তার থেকে লাভ হবে, তা দিয়ে প্রবন্ধের লোকসান পুষিয়ে যাবে। গৃহিণীর তাতে আপত্তি ছিল। যদিও ১৮৮১ সালের পর লেখা তবু উপন্যাস তো। উপন্যাস লিখলে তাঁকেই দিতে হবে, দিলে সেটা টলস্টয় রচনাবলীর শামিল হবে। রচনাবলীর প্রকাশক স্বয়ং টলস্টয়গৃহিণী। এ নিয়ে মতান্তর ও মনান্তর গৃহিণীর সঙ্গে প্রধান শিষ্যের। টলস্টয় শিষ্যকে ছাড়েন না। শিষ্যই তাঁর মতবাদ প্রচারের অগ্রণী।

যাই হোক, 'রেজারেকশন' টলস্টয় চড়া দামে বিক্রি করেন। তখন কপিরাইট যে তাঁর নিজের এটা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আয় যা হয় তা পরার্থে ব্যয়

হয়। দুখোবরদের অপরাধ ওরা সৈন্যদলে যোগ দেয় না। ওদের ধর্মমত আদি খ্রিস্টানদের অনুরূপ। যুদ্ধে মানুষ মারতে হয়। কিন্তু তাদের ওপর জোর-জুলুম করা হয়। তারা সহ্য করতে না পেরে দেশত্যাগের সংকল্প নেয়। টলস্টয় সহায় হন। 'রেজারেকশন' লিখে অর্থসাহায্য করেন। ওরা দেশত্যাগ করে।

স্ত্রীর সঙ্গে মতভেদ কেবল গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে নয়। গৃহিণী নিজেই ১৮৮১ সাল পর্যন্ত লেখা গ্রন্থের প্রকাশিকা হয়েছিলেন। তাতে লাভ হতো বেশি। টলস্টয়ের পুত্রকন্যা ছাড়াও বিস্তর আশ্রিত আশ্রিতা ছিল। এত বড়ো সংসার ঘাড়ে নিয়ে সোনিয়া দেখেন প্রকাশকরা যা দেন তা যথেষ্ট নয়। নিজে প্রকাশ করলে আয় হয় বেশি। ডস্টয়েভস্কি পত্নীও স্বামীর গ্রন্থ স্বয়ং প্রকাশ করে আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। টলস্টয় পত্নী তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কিন্তু টলস্টয় প্রণীত গ্রন্থ থেকে সংসারের যে আয় তো তো ১৮৮১ সালের পর রচিত গ্রন্থ থেকে হয় না। কেমন করে তাহলে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করবে? সোনিয়া তাই জমিদারির ভারও গ্রহণ করেন। টলস্টয় জমিদারি প্রথার ওপর বিরূপ হয়েছিলেন। শাসন ও শোষণ না করে জমিদারি চালানো যায় না। দুটোই তাঁর কাছে অন্যায় তাঁর মতে সব জমি চাষীদেরই দেওয়া উচিত। কিন্তু এত বড়ো ত্যাগের জন্যে পরিবার প্রস্তুত ছিল না। ওরা খরচ চালাবে কী করে? ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও বেড়েছে, বয়সও বেড়েছে। রোজগারে মন নেই। বাপকেই উপার্জন করতে হয়। শুধুমাত্র বইপত্রের আয়ে কুলায় না। শুধুমাত্র জমিদারির আয়েও কুলায় না। গৃহিণী শক্ত হাতে হাল ধরেন। কিন্তু তাঁর কড়াকড়ির জন্যে চাষীদের কাছে টলস্টয়ের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। গাছকাটার জন্যে জমিদারপত্নী কয়েকজনের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। ওদের সাজা হয়! টলস্টয়ের মতে সেটা অধর্ম। স্ত্রীর মতে আইনসঙ্গত।

এ সমস্ত সহ্য হতো। কিন্তু স্বামী চান দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রজনের মতো থাকতে। ধনীদের সঙ্গে ধনীদের মতো নয়। গান্ধী ও কস্তুরবার বেলা যেটা সম্ভব হয় টলস্টয় ও সোনিয়ার বেলা সেটা সম্ভব হয় না। টলস্টয় চান শ্রেণীচ্যুত হতে। সোনিয়া তাঁর সন্তানদের শ্রেণীচ্যুত হতে দেবেন না। জন্মসূত্রে ওরাও কাউন্ট ও কাউন্টেস। ওরা ওদের আভিজাত্য বজায় রাখবে– বাপের খরচে অবশ্য। দুনিয়ার কত লোক টলস্টয়কে গুরু বলে মানে। কিন্তু একজন কি দু'জন বাদে তাঁর পুত্রকন্যারাই মানে না। তাঁকে পাগল বলে সার্টিফিকেট দেবার প্রসঙ্গও নাকি উঠেছিল। তাহলে আদালত থেকে একজনকে তাঁর গার্জেন নিয়োগ করা হতো। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সেই গার্জেনই করতেন। কিন্তু তাঁর কলমটা কেউ কেড়ে

নিতে পারত না। দুনিয়া জানত তিনি পাগল নন। যাই হোক, তাঁকে পাগল বলে ঘোষণা করা হয়নি। এই রক্ষে।

ওদিকে চার্চ তো তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিলই, স্টেটও তাঁকে তাঁর বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করার অপরাধে জেলে পাঠাতে পারত, যদি সংবাদপত্র বিশেষের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথায় কাজ করত। তখনো ১৯০৫ সালে বিপ্লব ঘটেনি। বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর নরম মনোভাব তার বহুবর্ষ পূর্বের। বিপ্লবের সমর্থন তিনি করতেন না। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর যাদের ফাঁসি দেওয়া হলো তাদের প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি একটি সাংঘাতিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'আমি নীরব থাকতে পারিনে।' ফলে সারা দুনিয়ার সাড়া পড়ে যায়। তাতে তিনি বলেছিলেন, তাঁকেও যেন ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর জনপ্রিয়তা ফিরে আসে। রাষ্ট্র তাঁকে ঘাঁটায় না।

টলস্টয়ের পূর্বসূরি পুশকিন নাকি শতাধিক নারী সম্ভোগ করেছিলেন। টলস্টয়ের রেকর্ড অত লম্বা নয়। তাঁর মধ্যে এ নিয়ে বরাবরই একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। Flesh যা চাইছে spirit তাতে সায় দিচ্ছে না। বিবাহের পর স্বকীয়ার সঙ্গেও একই অন্তর্দ্বন্দ্ব। ব্রহ্মচর্যের সংকল্প বার বার নিয়েছেন। বার বার ভঙ্গ করেছেন। ফলে তেরোটি পুত্রকন্যা। তাঁর স্ত্রী গোড়া থেকেই অনিচ্ছুক। তাঁকে স্বাধীনতা দিলে তিনি দুটি কি তিনটির বেশি চাইতেন না। নারীর ওপর এতগুলি সন্তান চাপানো পুরুষেরই দোষ। এমনি করে পুরুষ নারীকে বন্দিনী করে রাখে। অথচ এর জন্যে তো কই টলস্টয়কে অনুতপ্ত হতে দেখা গেল না। 'ক্রয়টজার সোনাটা' আমি কলেজে পড়েছিলুম। ও বই আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। ওটা এই কারণেই মূল্যবান যে টলস্টয় নরহত্যার মতো নারীহত্যারও বিরোধী। কিন্তু ও কাহিনীর মরাল ইস্যুটা তো মার্ডার নয়, সেক্স। যেখানে নারীকেই দোষ দেওয়া হয়েছে। যেন নারীই একমাত্র পার্টনার।

টলস্টয়ের সেক্স সংক্রান্ত দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। বিবাহের পর স্বামীগৃহে এসেই আবিষ্কার করেন গ্রামবাসিনী আকসিনিয়াকে। যার পুত্রের প্রকৃত পিতা নাকি টলস্টয়? স্বামীকে চোখে চোখে রাখা সেই যে শুরু হয় তার পর আটচল্লিশ বছর ধরে চলে। নজরবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি বৃদ্ধ বয়সেও মেলে না। একদিন কি দু'দিন বাড়ির বাইরে কাটালেও সন্দেহ করা হতো যে উদ্দেশ্যটা নারীসঙ্গ। লেখার উপরেও কড়া নজর। সেক্স নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই সন্দেহ। অভিজ্ঞতার অনুপাতে সামান্যই তিনি লিখতেন। তাও রেখে ঢেকে। তবে বিবাহপূর্ব ডায়েরিতে সব কথা ছিল। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সে

ডায়েরি যেন অবিকল ছাপা হয়। সেটা কিন্তু হয়নি। অনেক বাদসাদ দেওয়া হয়েছে। পরিবারের বাইরেও তাঁর একটি পুত্র ছিল। তিনি তার নামটা পর্যন্ত ভুল করেন। তাকে স্বীকারও তিনি করেননি। তবে তাকে তাঁর বাড়িতে কোচম্যানের কাজ দেওয়া হয়েছিল। টলস্টয়ের জীবদ্দশায় 'The Devil' প্রকাশিত হয়নি স্ত্রীর ভয়ে। তাতে ছিল আকসিনিয়ার সঙ্গে প্রণয়ের উত্তাপ। সে এক কৃষকবধূ। সোনিয়ার ঈর্ষা বিবাহের ছেচল্লিশ বছর পরেও সমান তীব্র ছিল। স্বামীকে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৮৮৯ সাল। পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রাখা হয় চার্টকভের কাছে। চার্টকভও নিজের কাছে রাখতে সাহস পান না। রাখেন তাঁর মায়ের কাছে। কী মনে করে টলস্টয় ওর একটা নকল লুকিয়ে লুকিয়ে তৈরি করিয়ে এনে তাঁর এক পুরানো আরাম কেদারার অয়েল ক্লথের ঢাকনার আড়ালে লুকিয়ে রাখেন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও ওটি ধরা পড়ে যায় সোনিয়ার কাছে ১৯০৯ সালে। তার মানে টলস্টয়ের মৃত্যুর এক বছর আগে। পুরাতন ঈর্ষার ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। আশির ওপর বয়স। তবু নিস্তার নেই! পরকীয়া চাষাণীর সঙ্গে তিনি যে উল্লাস বোধ করেছিলেন তারই বর্ণনা ছিল নায়কের বেনামিতে। বিবাহের পর নায়ক তাঁর স্বশ্রেণীর স্বকীয়ার সঙ্গে উল্লাসের পরিবর্তে যাতনা বোধ করেন। এ এক নির্মম সত্য। একে লিপিবদ্ধ না করে টলস্টয়ের সোয়াস্তি ছিল না। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় স্ত্রীর নজরে পড়লে কী বিষম কাণ্ড হবে সেটাও তিনি অনুমান করেছিলেন। যা ঘটবার তা ঘটে যাবার পর দু'জনেই কান্নাকাটি করে শান্ত হন। ছাপা কিন্তু বন্ধ থাকে।

আমার তো মনে হয় টলস্টয়ের গৃহত্যাগের অন্যতম কারণ টলস্টয়ের সত্যকথনে নিদারুণ অসহিষ্ণুতা। আকসিনিয়ার প্রতি যে প্যাশন তার মতো প্যাশন তিনি সোনিয়ার প্রতি অনুভব করেননি। কিন্তু সেটা তো চুকেবুকে গেছে কতকাল আগে। তা হলেও সে আগুন যেমন লেখকের স্মরণে জীবন্ত ছিল, উপন্যাসের পাতায়ও তেমনি জ্বলন্ত। এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব। কিন্তু সোনিয়ার চোখে তিনি তো শিল্পী নন। তিনি স্বামী। যে স্বামী এতকাল পরেও সেই পুরাতন প্যাশনের বর্ণনায় মুখর তিনি কি স্ত্রীকে সত্যি ভালোবেসেছেন? স্ত্রীর বেলায় এমন নিরুত্তাপ কেন? বিবাহের ছেচল্লিশ বছর বাদে এই আবিষ্কার সোনিয়াকে পাগল করে তোলে। উইল, ডায়েরি ইত্যাদির দরুন যে অশান্তি তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এই আত্মজীবনীমূলক গুপ্ত পুঁথির দরুন।

টলস্টয়ের নিজের চরিত্রেও ঈর্ষা নিহিত ছিল। সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ তাঁর চুয়ান্ন বছর বয়সের স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন কেন তিনি তানেয়েভ নামক সঙ্গীতকারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বোনের বাড়ি যান। তিনি কি সঙ্গীতের প্রেমে অন্ধ, না সঙ্গীতকারের প্রেমে? সোনিয়া তো ক্রোধে উন্মাদ। স্বামীকে শাসিয়ে বলেন, "তুমি যদি তোমার 'রেজারেকশন' প্রকাশ কর তো আমিও আমার ছোটগল্পগুলো প্রকাশ করব।" শেষে সন্ধি হয়।

(শ্রী নারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত পত্রের রূপান্তর)

(১৯৮০)

পরিশিষ্ট

তিনটি প্রশ্ন

(টলস্টয়ের লেখা থেকে অনুবাদ)

এক সময় এক রাজার এই ধারণা হলো যে যদি তিনি জানতে পারতেন কখন কোন্ কাজ করা উচিত, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি কে, আর কোন্‌টাইবা সবচেয়ে দরকারি কাজ, তবে কোনো বিষয়েই তিনি অকৃতকার্য হতেন না।

এই ভেবে তিনি রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করলেন, যে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে সে প্রচুর পুরস্কার পাবে।

রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিত সকলেই এলেন, কিন্তু সকলেই প্রশ্ন তিনটির বিভিন্ন উত্তর দিলেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ বললেন, উপযুক্ত সময়ে কাজ করতে হলে পাঁজি একখানা কাছে রেখে পাঁজির নির্দেশ মতো কাজ করা আবশ্যক। কেউ কেউ বললেন, আগে থেকে কখন কী করতে হবে ঠিক করা অসম্ভব। তুচ্ছ আমোদপ্রমোদে সময় নষ্ট না করে যখন যা দরকার হয় তাই করা উচিত। তবেই জানা যাবে কোন্ কাজ সবচেয়ে দরকারি। আর কেউ কেউ বললেন, কখন কোন কাজ করা উচিত একা তা স্থির করা অসম্ভব, সুতরাং রাজার একটি মন্ত্রণা সভা থাকা চাই। মন্ত্রণা সভাই সকল কাজের উপযুক্ত সময় স্থির করবেন।

আরও অনেক ছিলেন। তাঁরা বললেন, এমন অনেক বিষয় আছে, যা তৎক্ষণাৎই স্থির করতে হলে ভবিষ্যতে কী হবে তা আগে জানা চাই। জ্যোতিষীরাই তা জানে— সুতরাং জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে জানতে হয় কখন কোন্ কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো বিভিন্ন রকমের। কেউ বললেন, রাজার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মন্ত্রী। কেউ বললেন, পুরোহিত। কেউ কেউ বললেন, চিকিৎসক; কেউ কেউবা বললেন, সৈনিকই রাজার সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বললেন, বিজ্ঞানই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়। কেউ বললেন, রণকৌশল। কেউবা বললেন, দেবপূজাই সবচেয়ে দরকারি কাজ।

প্রশ্ন তিনটির সমস্ত উত্তরই বিভিন্ন হওয়ায় রাজা কারও সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। পুরস্কারও দিলেন না। কিন্তু তবুও প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাওয়ার ইচ্ছা থাকায় জ্ঞানের জন্যে সর্বত্র বিখ্যাত একজন সাধুর সঙ্গে পরামর্শ করা স্থির করলেন।

এই সাধু যে বনে বাস করতেন সে বন ছেড়ে কখনো কোথাও যেতেন না। তিনি সাধারণ লোকদেরই অভ্যর্থনা করতেন; সুতরাং রাজা সাধারণ লোকের বেশেই গেলেন। সাধুর কুটীরের কিছু দূরে ঘোড়া ও রক্ষী সৈন্যদের রেখে একাই সাধুর কাছে গেলেন।

গিয়েই দেখলেন সাধু কুটিরের সামনের জমিতে কেয়ারি করছেন। অভ্যর্থনা করেই আবার কাজ করতে লাগলেন। কাছে গিয়ে রাজা বললেন, 'বিজ্ঞ, আপনার কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে আমি এসেছি। কখন কোন্ কাজ করা উচিত, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি কে আর সবচেয়ে দরকারি কাজ কোনটা।'

সাধু শুনলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না, কাজ করতে লাগলেন। রাজা বললে, 'আপনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; কোদালটা আমাকে দিন, আপনার জন্যে কিছু কাজ করে দিই।'

'ধন্যবাদ', বলে সাধু কোদালখানা রাজার হাতে দিলেন।

দুটি কেয়ারি করেই রাজা আবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

এবারেও সাধু কোন উত্তার দিলেন না কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোদালের জন্যে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এখন একটু বিশ্রাম কর, আমি কিছুক্ষণ কাজ করি।'

রাজা কোদাল না দিয়ে আরও দু'ঘণ্টা কাজ করলেন।

সূর্য অস্তগামী হলেন। রাজা কোদাল রেখে বললেন, 'বিজ্ঞবর, আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর পেতেই আপনার এখানে এসেছি। যদি আপনি উত্তর না দিতে পারেন তাও বলুন, আমি বাড়ি ফিরে যাই।'

'ঐ দেখ দেখ, কে একজন এদিকে দৌড়িয়ে আসছে। দেখা যাক সে কে।' সাধু বললেন।

রাজা দেখলেন দাড়িওয়ালা কে একটি মানুষ বনের ভিতর দিয়ে দৌড়িয়ে আসছে। মানুষটি দু'হাত দিয়ে তার তলপেটটা চেপে ধরেছে। হাতের নিচে রক্তপ্রবাহ। রাজার কাছে এসেই সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। রাজা ও সাধু দু'জনে মিলে লোকটির পরিচ্ছদ খুলে ফেললেন। পেটের নিচেই একটা প্রকাণ্ড ক্ষত। রাজা নিজের রুমালখানি ও সাধুর তোয়ালেখানা নিয়ে ক্ষতটি ভালো করে বেঁধে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় লোকটির চেতনা হলো— সে একটু জল চাইলে। রাজা জল এনে দিলেন।

এর মধ্যে সূর্যাস্ত হয়েছে। রাজা ও সাধু দু'জনে মিলে লোকটিকে কুটিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন ও একখানি বিছানায় শুইয়ে দিলেন। লোকটি চোখ বুজে আরাম বোধ করলে। কিন্তু রাজা এত পথ এসে ও এত কাজ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। শোওয়া মাত্রেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে জেগে উঠেই রাজা দেখলেন সেই লোকটি তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তিনি কোথায় সেই লোকটিকে দেখেছেন তা স্মরণ করতে তাঁর বিলম্ব হলো। রাজাকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে লোকটি ক্ষীণ স্বরে বললে, 'আমাকে ক্ষমা করুন।'

'আমি তো তোমাকে চিনি না— কিসের জন্যে তোমাকে ক্ষমা করতে হবে?' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি আমাকে চেনেন না— কিন্তু আমি তো আপনাকে জানি। আপনি আমার ভাইকে হত্যা করেছেন, আমার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন, এর প্রতিশোধ নেব বলে আমি শপথ করেছিলুম, আপনি সাধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনে আমি আপনার ফেরবার পথের ধারে লুকিয়ে ছিলুম আপনাকে হত্যা করবার ইচ্ছায়।

দিন গেল, তবুও আপনি ফিরলেন না। কাজেই, আমার লুকোবার জায়গা থেকে বার হলুম। কিন্তু হঠাৎ আপনার রক্ষীদের হাতে পড়ে যাওয়ায় তারা আমাকে চিনতে পেরে আহত করে। আমি ওদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পালিয়ে এলুম কিন্তু যাক আপনি আমার শুশ্রূষা না করতেন তবে আমি নিশ্চয়ই মারা যেতুম। আমি আপনাকে মারতে চেয়েছিলুম, কিন্তু আপনি আমাকে রক্ষা করলেন। এখন, যদি আমি বাঁচি আর আপনি সম্মত হন, তবে আমি আপনার সবচেয়ে বিশ্বাসী ক্রীতদাসের মতো আপনার সেবা করব ও আমার ছেলেদেরও তাই করতে বলব। আমাকে রক্ষা করুন।'

রাজা তাঁর শত্রুর সঙ্গে এত সহজে সন্ধি করতে পারায় ও তাকে বন্ধুরূপে লাভ করায় বড় খুশি হলেন। শুধু যে তাকে ক্ষমা করলেন তা নয়, নিজের চাকর ও চিকিৎসকদের তার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে পাঠিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিতেও প্রতিজ্ঞা করলেন।

আহত ব্যক্তিটির কাছে বিদায় নিয়ে রাজা সাধুর খোঁজে গেলেন। ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর প্রশ্ন তিনটির উত্তর জানতে আর একবার ইচ্ছে করলেন। সাধু তার নতুন তৈরি কেয়ারিগুলিতে বীজ বপন করছিলেন। রাজা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'সাধুশ্রেষ্ঠ আমার প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিতে শেষবার প্রার্থনা করছি।'

রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করে সাধু বললেন, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর তো তুমি পেয়েইছ।'

'পেয়েছি? বলেন কি আপনি?' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

'বুঝতে পারছ না?' সাধু বললেন, 'কাল যদি আমার দৌর্বল্য দেখে তোমার দয়া না হতো, এসব কেয়ারি যদি তুমি না করতে, যে পথে তুমি এসেছিলে সেই পথেই যদি চলে যেতে, তবে সেই লোকটা নিশ্চয়ই তোমাকে আক্রমণ করত—আর তুমিও আমার কাজে কেন থাকলে না এই ভেবে আক্ষেপ করতে। সুতরাং যখন তুমি কেয়ারি করছিলে সেই সময়ই ছিল তোমার কাজ করার উপযুক্ত সময়, আমিই ছিলেম সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, আর আমার আমার উপকার করাই ছিল তোমার সবচেয়ে দরকারি কাজ। পরে যখন সেই লোকটি দৌড়িয়ে এলো আর তুমি তার শুশ্রূষা করলে, সেই সময়ই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। যদি তুমি তার শুশ্রূষা না করতে সে নিশ্চয়ই মারা যেত। তুমি তার সঙ্গে মিত্রতা করতে পারতে না। সুতরাং সেই হলো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। আর তুমি তার যা করলে তাই হলো তোমার সবচেয়ে দরকারি কাজ। তবে মনে রেখো, সবচেয়ে উপযুক্ত সময় মোটে একটি—'এখন' এইটিও সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, কারণ এই সময়েই আমাদের যা কিছু ক্ষমতা থাকে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি সেই, যার সঙ্গে তুমি এখন আছ। কেননা কেউ জানে না কখনো আর কারও সঙ্গে তার কোনো কাজ থাকবে কি না। সবচেয়ে দরকারি কাজ তার উপকার করা। কারণ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই এই।'

(১৯২০)

সমাপ্ত